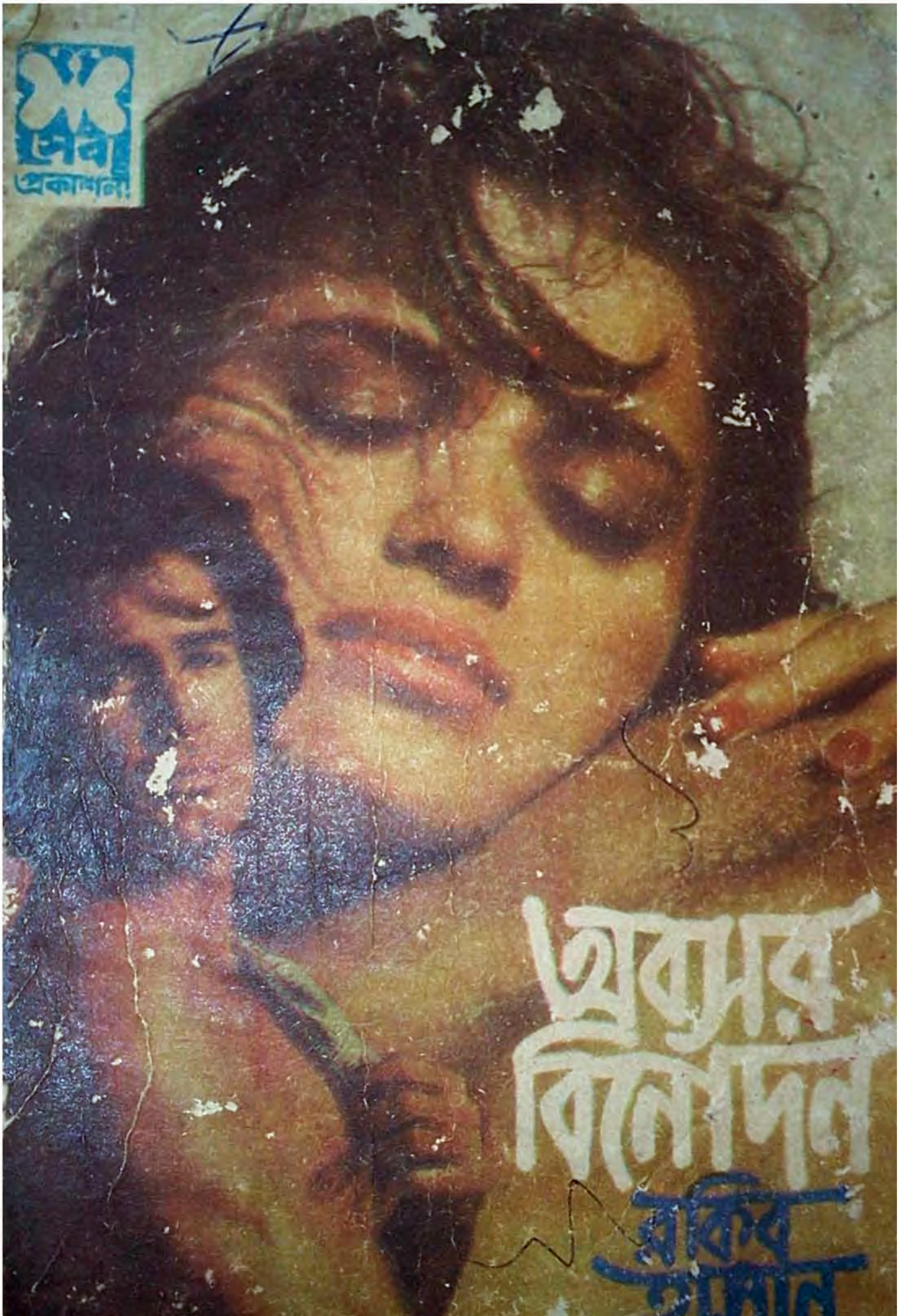
সেবা প্রকাশনী
অবসর বিনোদন
রকিব হাসান

রকিব হাসানের

এক খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অবসর বিনোদন

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কর্মশালা উপলক্ষে
কক্সবাজারের মনোরম পরিবেশে
উপস্থিত হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
নামী-দামী প্রযোজক, পরিচালক
শিল্পী ও কলাকুশলীরা।
সরগরম!

কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না
ধনীর দুলাল জুবের আলমের। কিছু না।
কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না জীবনের।
ভাবছে, একটা খুন করে দেখলে কেমন হয়?
খুব উত্তেজনা হবে, তাই না?
বেশ হয় কিন্তু।

বার টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

অবসর বিনোদন

কিছু ভাল লাগে না, তাই মজার জন্যে খুন

রকিব হাসান

এক

কক্সবাজার।

রঙচঙে ফেস্টুন, পোস্টার আর ব্যানারে ছেয়ে গেছে ছোট্ট শহরটা। উপলক্ষ: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কর্মশালা। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, দুই জার্মানী, প্রতিবেশী ভারত এবং মার্কিন মুলুক থেকে হোমরা-চোমরা সব চলচ্চিত্রকার, নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলী এসেছেন। বাংলাদেশ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির নামজাদা প্রযোজক, পরিচালক এবং অন্যান্য সবাই তো আছেনই। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা দেশী বিদেশী ফটোগ্রাফার আর সিনে জার্নালিস্টদের ব্যস্ত-সমস্তভাবে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। মুখরোচক অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও খবরের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে তারা। ভাষণ এবং প্রবন্ধ পাঠের আসর বসছে বড় বড় হোটেলগুলোর কনফারেন্স রুমে। সদ্য তৈরি প্যাভেলিয়ান এবং স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে চলছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

নিমন্ত্রিত মেহমানের সংখ্যা পাঁচ সাড়ে পাঁচ শোর বেশি হবে না, কিন্তু অনাহূত দর্শক, পর্যবেক্ষক, কলাকুশলী এবং সম্ভাবনাময় শিল্পী-

দের সংখ্যা পনের হাজারকেও ছাড়িয়ে যাবে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্যে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ছোট বড় কোন হোটেলেই কোন রুম খালি নেই। অগত্যা বাধ্য হয়েই হাজার হাজার লোক রামু কিংবা আশপাশের আর কোন জায়গায় ফিরে যাচ্ছে রাত্রিবাসের জন্যে। বিশেষ কোচ সার্ভিসের ব্যবস্থা ছাড়াও বন্দর নগরী চট্টগ্রাম আর কক্সবাজারের মধ্যে চলাচলকারী বাসের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। সব দিক সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। কর্মশালার উদ্যোক্তা অর্থাৎ এফ. ডি, সি. কর্তৃপক্ষ ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি দেশের সর্বস্তরের দর্শক এবং ঢাকার শিল্পী ও কলাকুশলীরা ব্যাপারটাকে এতটা গুরুত্বের সাথে নেবে। সেজন্যে অবশ্য তাদেরকে দোষ দেয়া চলে না। কারণ, এই কর্মশালা ঠিক উৎসব নয়। উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকার, নির্মাতা, এবং শিল্পীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে পেশাগত জটিলতা, টিভি এবং ভি-সি-আর-এর দাপটে কোণঠাসা চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ, অভিনয় প্রতিভা উন্মেষের পথে বাধা, শিল্প নির্মাণে নব নব টেকনিকের সদ্ব্যবহার এবং দর্শকদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের সর্বশেষ বক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করবেন। এই ধরনের একটা প্রায়-নীরস অনুষ্ঠানমালায় প্রচুর লোকসমাগম না হবারই কথা। অবশ্য নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা আসছেন তাঁরা তাঁদের কাজের কিছু নমুনাও সাথে করে আনবেন, সমালোচক এবং পর্যবেক্ষকরা সেগুলো দেখবেন, মূল পরিকল্পনার মধ্যে এই রকম একটা ব্যবস্থাও ছিল। ভিড় কিছুটা বাড়ার জন্যে এই কাজের নমুনা, অর্থাৎ ছবি দেখার লোভ বেশ খানিকটা দায়ী। কিন্তু এফ. ডি. সি.-কে অচল করে দিয়ে ঢাকা থেকে প্রায় সব শিল্পী এবং কলাকুশলীদের

কক্সবাজারে চলে আসার পিছনে রয়েছে অন্য কারণ। কর্মশালার শুরুতে হঠাৎ করেই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, বিদেশী এবং দেশী উদ্যোগে যৌথভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্যে বেশ কয়েকটি চুক্তির কথা পাকা হয়ে গেছে, এই কর্মশালা চলাকালেই কলাকুশলী এবং শিল্পী নির্বাচন করা হবে। তাই দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র নির্মা-তাদের চোখে পড়ার জন্যে এখানে এসে ভিড় করেছে তারা।

সৈকত। বিকেলের রোদ গায়ে মেখে ক্যানভাসের তৈরি ইজি-চেয়ারে বসে আছে জুবের আলম। কোলের ওপর একটা খোলা বই। চোখে সানগ্লাস। গাঢ় নীল রঙের বড় বড় কাঁচে মুখের অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। সব সময় এই সানগ্লাস পরে থাকায় জুবের আল-মের চোখ দুটো কেউ দেখতে পায় না।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে একটা মেয়ের ছবি তুলছে একদল ফটোগ্রাফার। তাদের মধ্যে দেশী ফটোগ্রাফারও রয়েছে, তবে বিদেশী ফটোগ্রাফারের সংখ্যাই বেশি। আকাশী রঙের একটা বিকিনি পরেছে মেয়েটা, বাংলাদেশী বলে চেনাই যায় না। কিন্তু সেজন্যে বিকিনিটা দায়ী নয়। ঝুরঝুরে বালির ওপর তার বসার ভঙ্গি এবং সারা শরীরে অসাধারণ রূপ-যৌবনের ঢলই এর জন্যে দায়ী। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা মেয়েটা, গায়ের রঙটাও দুধে-আলতায়। মাথা থেকে নেমে এসে কুঁচবরণ কালো কেশ নিতম্বের কাছে বালির ওপর মেঘের একটা ঢেউ-খেলানো স্তূপ তৈরি করেছে। মুখটাও ভারি সুন্দর, কোথাও কোন খুঁত নেই। আর ঘুরে-ফিরে নড়েচড়ে বসার ভঙ্গিগুলোর বুঝি কোন তুলনাই হয় না। এমন সহজ সাবলীলভাবে যৌনাবেদন সৃষ্টি করা আর কোন বাঙালী মেয়ের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়।

কিন্তু মেয়েটির রূপ-লাবণ্য বা যৌনাবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা, কোনটাই আকৃষ্ট করল না জুবেরকে। কোন মেয়েই. তা সে যতই কিনা সুন্দরী হোক, কখনই তাকে উত্তেজিত করে তোলে না। কিন্তু মেয়েটার মধ্যে আশ্চর্য একটা প্রাণ-চাঞ্চল্য আছে, সেটা তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। মনের ভেতর কে যেন অত্যন্ত রূঢ় ভঙ্গিতে জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জানতে চাইল, কেন. এত কেন হাসি খুশি দেখাবে ওকে? কিসের এত আনন্দ ওর? কিসের এত ছটফটানি?

সারা শরীরে অদ্ভুত একটা ঈর্ষার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না জুবের, কিন্তু কারণটা খুঁজে বের করারও কোন ইচ্ছে হয় না তার। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। মগজের ভেতর কোথাও আবার সেই পুরানো আলোড়নটা অনুভব করল সে। মগজের ভেতর বারবার খোঁচা দিয়ে কে যেন ভয়ংকর একটা ঝোঁক, একটা বিপজ্জনক প্রবণতা সৃষ্টি করতে চাইছে তার মনে।

আজ প্রায় দশ বছর ধরে, মোটামুটি তার জ্ঞান হবার পর থেকেই ঘটছে ব্যাপারটা। প্রথমদিকে মগজের ভেতর আলোড়নটা সৃষ্টি হলেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ত জুবের। 'একটা মেয়েমানুষ খুন করলে হয়।' নিজেকে পাগল মনে হত তার। সবার চোখের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে বুক ভাসাত। সেজন্যে ধরা পড়ে গিয়ে সৎ মায়ের বকুনিও তাকে কম খেতে হয়নি। 'এমন পাগল ছেলে তো আর কোথাও দেখিনি।' কথাটা শুনে শুনে কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে তার। কেন, কেন সবাই তাকে পাগল বলে?

এরপর ভয়টা ধীরে ধীরে কেটে গেল তার। মাথার ভেতর সেই ঝোঁকটা এলে এখন আর তার ভয় লাগে না। চিন্তাটাকে টেনে টেনে লম্বা করে সে। উপভোগ করে। সম্ভাবনাটাকে নানা দিক থেকে যাচাই

করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই রকম একটা সাংঘাতিক চিন্তা কেন তার মাথায় আসে তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামায় না। এর কারণ সম্ভবতঃ, নিজেকে সে ভুলেও কোন দিন পাগল বলে ভাবতে পারেনি। সবাই তাকে পাগল বলে গাল দেয়ার ফলে এই একটা বড় লাভ হয়েছে তার। নিজের সম্পর্কে ক্ষীণ যে সন্দেহটা ছিল সেটা মন থেকে দূর হয়ে গেছে। সবার পাগল অভিযোগটা থেকে বাঁচার জন্যে কানে তুলো গুঁজেছে সে। গায়ে একটা বর্ম পরে নিয়েছে। এখন আর কেউ পাগল বললে নিজের সম্পর্কে সন্দেহে ভোগে না সে। অনেক দিন আগেই বিশ্বাসটা মনের ভেতর গেঁথে নিয়েছে সে— আমি পাগল নই।

মগজের ভেতর সেই ইচ্ছেটা মাথা কুটতে শুরু করল। 'খুন কর। একটা মেয়েমানুষ খুন কর।' এতদিন যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে প্ররোচনাটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়নি। কিন্তু আজ এই উচ্ছল মেয়েটিকে দেখার সাথে সাথে সমস্ত যুক্তি আর বুদ্ধি উল্টো খাতে বইতে শুরু করেছে। দিন শেষের উষ্ণ রোদে বসে অবসর বিনোদনের নির্মল ইচ্ছেটা কিভাবে যেন উবে গেল। মনের ভেতর থেকে কথা বলছে আরেকজন, ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, জুবের, এই মেয়েটাকেই। একে দিয়েই পরীক্ষা হয়ে যাক তোমার বুদ্ধি, সাহস আর নৈপুণ্য।'

সিগারেট ধরাল জুবের। মনে মনে স্বীকার করল, বেশ একটু ভয় পেয়েছে আজ সে। এর আগে যতবার সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটাবার তাগাদা এসেছে মনের ভেতর থেকে, সে জানত, ঝোঁকটাকে দমন করতে পারবে সে। পেরেছেও। কিন্তু আজ আর তার সেই মনের জোর নেই। স্বাধীন ভাবে যে চিন্তা করবে, তার কোন সুযোগই

পাচ্ছে না। অবিরাম অবিরত মনের ভেতর কথা বলছে কে যেন। তার কথা শুনতে শুনতে বয়ে যাচ্ছে প্রতিটি সেকেণ্ড, নিজে যেন আলাদা ভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না। 'জুবের, বুঝতে পারছ না? এই মেয়েটির জন্যেই তো। হ্যাঁ, এতদিন এর জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলে তুমি। লক্ষ্মী ছেলে, তৈরি হয়ে নাও, খুন কর ওকে। দেখছ না, কোন অসুবিধে নেই? সিনেমায় অভিনয় করে ও—অভিনেত্রী। ওকে একা পাওয়া কোন সমস্যাই নয়। শুধু বলতে হবে, তোমার বাবা ওর সাথে দেখা করতে চান। যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হবে। আর কিছু বলতে হবে না, সুড় সুড় করে তোমার পিছু পিছু চলে আসবে।'

সোনার সিগারেট কেসটা অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছে জুবের। স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তা করতে গিয়ে সৎ মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। চার মাস আগে ওর একুশতম জন্মদিন উপলক্ষে এই সোনার সিগারেট কেসটা উপহার দিয়েছিল ওকে।

আবার মেয়েটার দিকে তাকাল জুবের। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার দিকে মুখ করে, দু'হাতের তালুর ওপর চিবুক রেখে বসেছে সে। সুঠাম লম্বা পা দুটো বালির ওপর থেকে তুলে দিয়েছে, আড়াআড়ি ভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে গোড়ালি জোড়া। ঝর্ণার উচ্ছ্রিত ধারার মতো টান টান উদোম পিঠ। আঁটসাঁট বিশাল নিতম্ব। মেয়েটার শরীরে যৌবনের বিস্ময়কর ঢল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে ফটোগ্রাফাররা। কোনদিকে খেয়াল নেই কারো, একের পর এক ছবি তুলতে ব্যস্ত তারা।

স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেল জুবের। সত্যিই তো। সিনেমায় যে-সব মেয়ে অভিনয় করে তাদেরকে একা পাওয়া

কোন সমস্যাই নয়। এম. টি, এ অর্থাৎ মোহাম্মদ তোহা আলমের ছেলে সে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও প্রযোজক-পরিচালক হিসেবে তার বাবার খ্যাতি আছে। সিনেমা সম্পর্কে সামান্যতম খবরও যারা রাখে তারাও মোহাম্মদ তোহা আলমের নাম জানে। সেই স্বনামধন্য তোহা আলমের ছেলে যদি কোন মেয়েকে বলে, বাবা তোমার সাথে দেখা করতে চান, সেই মেয়ের মনে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা আসতে পারে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করল জুবের, ভেতর থেকে খুন করার প্ররোচনাটা অনুভব করে এখন আর তার ভয় লাগছে না। বরং অদ্ভুত একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে সে। সেই সাথে অনাস্বাদিত একটা রোমাঞ্চ। বাবার ওপর খুশি হয়ে উঠল সে। এই কর্মশালায় আসার কোন ইচ্ছেই ছিল না তার। কিন্তু বাবা একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে পিছু লেগে ওকে আসতে রাজি করিয়েছেন। ছেলেকে ছবি বানানো শেখাতে চান তিনি। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে, অবসর সময়ে ফরাসী আর জার্মান ভাষা শিখে, বিদেশী দূতাবাস কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের সাথে ওঠা-বসা করে পশ্চিমা আদব-কায়দা, ভাবভঙ্গি ভালই রপ্ত করেছে তাঁর ছেলে। বাকি শুধু প্রাথমিকভাবে টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন। সেটুকু হলেই ছেলেকে তিনি ট্রেনিঙের জন্যে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন। ভবিষ্যতে বিদেশী পুঁজির সহায়তায় ছবি তৈরি করার ইচ্ছে আছে তাঁর, সেই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চান নিজের ছেলেকে। সেজন্যেই অভিজ্ঞতা অর্জনের এই সুবর্ণ সুযোগটা থেকে ছেলে যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে কড়া দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বিখ্যাত বাবার পিছু পিছু কর-

বাজারে আসতে হয়েছে জুবেরকে। মনটা তার কোনদিনই ভাল থাকে না, তাই ভেবেছিল, যাই, এই উপলক্ষে অবসরটা বিনোদনের মধ্যে কাটিয়ে দেয়া যাবে। এমনিতে নিজের জীবনের সবটুকু সময়ই অবসর বলে মনে হয় তার, যদিও তাতে বিনোদনের চিহ্ন মাত্র নেই। তাই ওই বিনোদনের আশাতেই এখানে আসা। তা, এসে সে ভালই করেছে। সত্যি সত্যি চমৎকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে চিত্ত-বিনোদনের।

মায়ের কথা মনে পড়ে জুবেরের। বারো বছর আগে ঢাকার একটা ছয়তালা হোটেলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। মনে পড়ে, মা বলতেন, 'তুই একটা পাগল। জানিস, মাঝে মাঝে আমিও কেমন যেন হয়ে যাই। মনে হয়, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আসলে কি জানিস, তোর নানার বংশে সবাই কমবেশি ক্যাপাটে ছিলেন। কে জানে, ব্যাপারটা হয়ত বংশগত।'

কিন্তু, মা পাগল ছিলেন কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা নিজের ছেলের প্রতি তাঁর কোন টান ছিল না। কোন দায়িত্ব নেবেন, সে প্রকৃতিই ছিল না তাঁর। ছেলেকে মানুষ করার ঝক্কি তিনি পোহাতে চাননি। জুবের যখন বড় হল, তখনও মায়ের কাছে ঘেঁষতে পারত না। মা তাকে এড়িয়ে চলতেন। এবং, আরো একটু বড় হতে জুবের বুঝতে পেরেছিল, মা তাকে ঘৃণা করেন। অন্ততঃ তাকে দূরে সরিয়ে দেবার ইচ্ছেটা লক্ষ্য করে সেটাই ধরে নিয়েছিল জুবের।

মায়ের এই ঘৃণা নীরবে মেনে নিয়েছিল সে। জ্ঞান হবার পর থেকে সে-ও তাঁকে এড়িয়ে চলত। মাকে এড়িয়ে চলার এই প্রবণতাটা কিছুদিনের মধ্যেই নারী জাতিকেই এড়িয়ে চলার প্রবণতায় পরিণত হল। সবাই ধরে নিল, জুবের সাংঘাতিক লাজুক ছেলে।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মাকে সে পাল্টা ঘৃণা করত না। হয়ত মা বলেই! কিন্তু অন্যান্য যে-সব মেয়ে-মানুষকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল সে, তাদের প্রতি অদ্ভুত এক বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করত সে। এর কারণটা যে কি তা জুবের নিজেও ভাল বুঝতে পারে না। সম্ভবতঃ ওর জীবনে যত নারী চরিত্র এসেছে তারা সবাই ওকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি, তাই। হয়ত তারা ওকে বুঝতে চেষ্টা করেনি, তাই। কিংবা তারা হয়ত ওর সাথে অন্যায় ব্যবহার করত, তাই।

মা মারা যাবার পর আরো দু'বার বিয়ে করেন বাবা। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে প্রথম থেকেই বনিবনা হয়নি। স্বামীর অগাধ সয়-সম্পত্তি আর টাকা পয়সার দিকে তার ছিল লোভাতুর দৃষ্টি। স্বামীর মৃত্যুর পর এসবের মালিক যদি জুবের হয়, এই ভয়ে দিনের খাওয়া-দাওয়া আর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল তার। শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা স্বামীকে বলেই ফেলে স্ত্রীর আশংকা অমূলক প্রমাণ করার জন্যে তার নামে ঢাকা শহরের দুটো বাড়ি লিখে দেন তোহা আলম। কিন্তু তাতে মন ভরেনি স্ত্রীর। বায়না ধরে, গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি এবং ব্যাংকের সব টাকা চাই তার। তার বায়না শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতেন তোহা মোহাম্মদ, অন্ততঃ জুবেরের তাই ধারণা, কিন্তু মাঝখানে একটা কেলেংকারী ঘটে যাওয়ায় সেই মহিলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। বুড়ো স্বামীর ঘর করে সুখী হতে পারেনি সে, তাই স্বাস্থ্যবান এক সুদর্শন যুবকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। ফলাফল: বিবাহ-বিচ্ছেদ।

তোহা আলমের বর্তমান স্ত্রীর নাম জেসমিন আলম। জুবেরের সাথে তার বয়সের খুব একটা ব্যবধান নেই, প্রায় সমবয়েসী, হয়ত

দু'এক বছরের বড় হবে জেসমিন শুধু সুন্দরী বললে কম বলা হয়, অসাধারণ সুন্দরী। চোখ দুটো বিশাল। সুন্দর ছিমছাম গড়ন। চেহারায় র‍্যাফায়েলের ম্যাডোনার ছাপ আছে। প্রতিভাময়ী নায়িকা হিসেবে সারাদেশে নাম ছড়িয়ে পড়ছিল, এই সময় তোহা আলমের সাথে বিয়ে হয় তার। কোটিপতি স্বামী পেয়ে তার সমস্ত উচ্চাভিলাষ মিটে গেছে। বিয়ের পর ছায়াছবির জগত থেকে চির বিদায় নিয়েছে সে।

প্রায় সম-বয়েসী হলেও, জেসমিনকেও সব সময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে জুবের। তার উপস্থিতিতে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে সে। মেয়েদের প্রতি তার মনে যে ঘৃণা জন্মেছে, এই অস্বস্তিবোধ করার পিছনে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। এর কারণ সম্ভবতঃ, জেসমিনের আগুন-ঝরা রূপ। এই রূপের সামনে পড়লেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে জুবের। ভয়, নিজেকে হয়ত সামলাতে পারবে না।

অথচ, একমাত্র জেসমিনই তার সাথে কখনও কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। সেজন্যে জুবের অবশ্য তার প্রতি কোনরকম কৃতজ্ঞতা বোধ করে না। জেসমিন তার সাথে ভাল ব্যবহার কেন করে, এর একটা ব্যাখ্যাও তৈরি করে নিয়েছে সে। তার ধারণা, আর সবার চেয়ে অনেক বেশি চালাক জেসমিন, তাই কখনও মুখ ফুটে বলে না যে জুবের একটা পাগল কিন্তু মনে মনে ঠিকই বিশ্বাস করে। আর পাগলকে কে না ভয় পায়? এই ভয়েতেই তার সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে জেসমিন। চালাক মেয়ে, জানে, পাগল যদি একবার ক্ষ্যাপে তাহলে ভারি মুশকিল।

ওদিকে জুবেরের হাবভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় জেসমিন। এ কেমন ছেলে! কারো সাথে কথা বলে না, সামনাসামনি পড়ে

গেলে এমন ভাব করে যেন বাঘ দেখেছে, পালাতে পারলে বাঁচে। ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে জুবেরকে যথাসম্ভব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখেছে জেসমিন। তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে শুধু দর দর করে ঘেমে উঠতেই দেখেছে জুবেরকে, তার মনেরখ বর কিছুই জানতে পারেনি। সৎ মায়ের এই রকম আচরণ দেখে মনে মনে রেগে যায় জুবের। ভাবে, আমি কি একটা গিনিপিগ নাকি? নিজেকে নিজের ভেতর আরো গুটিয়ে নেয় সে।

নামকরা হোটেল রেনবোয় আজ তিন দিন ধরে রয়েছে আলম পরিবার। এই চলচ্চিত্র কর্মশালা শেষ হলেই রোম চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ঢাকা থেকে ফ্লাইট ধরবে তারা। গত তিন দিন তোহা আলম স্ত্রী জেসমিনকে সাথে নিয়ে একের পর এক ছবি দেখে কাটিয়েছেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখাবার জন্যে নিজেরও একটা বহুল আলোচিত ছবি আছে তোহা আলমের কর্মশালার শেষ দিন দেখানো হবে সেটা। সেরা ছবির জন্যে পুরস্কার হিসেবে নগদ প্রাপ্তি বা সোনার মেডেলের আয়োজন করা না হলেও, সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা আছে। টাকা বা মেডেলের চেয়ে অনেক বেশি দামী, অনেক বেশি মর্যাদার দাবীদার সেই সার্টিফিকেট। সেটা যে তোহা আলমের কপালেই ঝুলছে, তাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নেই কারো মনে।

প্রদর্শিত ছবিগুলো ছেলেও দেখবে বলে আশা করেছিলেন তোহা আলম, কিন্তু এ ব্যাপারে বাপকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে জুবের। তিন দিনে একটা ছবিও দেখা হয়নি তার। সময় কোথায়! সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সাগরের তীরে ঘুরে বেড়ানোতেই

ব্যস্ত সে। আসলে হোটেলে যাতে থাকতে না হয় তার জন্যেই সৈকতে সময়টা কাটায় জুবের। হোটেলে থাকলেই তো হয় বাবার নয়ত জেসমিনের সামনাসামনি পড়তে হবে।

মুখ তুলল জুবের। বিকিনি পরা মেয়েটার দিকে তাকাল আবার।

উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। লম্বা, মেদহীন পা দুটো সামান্য একটু ফাঁক। হাত দুটো উঠে এসেছে মুখের সামনে. উচ্ছল হাসিতে থরথর কাঁপছে প্রায়-নগ্ন যৌবন। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করছে এখনও। হঠাৎ ঘাড় ফেরাল জুবের। টলতে টলতে এগিয়ে আসছে একজন লোক। দেখেই চিনল ও। পাঁড় মাতাল। জুবেরকেও দেখামাত্র চিনতে পারল সে।

'কেমন আছেন?' কালো কুৎসিত লোকটা জুবেরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'ছবি দেখতে না গিয়ে একা একা বসে আছেন যে?'

মনে মনে রাগ হল জুবেরের। আর সময় পেল না ব্যাটা ফটো-গ্রাফার। কিন্তু যতই অসন্তুষ্ট হোক, সবার সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে থাকে সে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মৃদু হেসে বলল. 'সব ছবিই কি আর ভাল।'

'আপনার বাবা কিন্তু এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত,' বলল সাংবাদিক ফটোগ্রাফার। 'একটা ছবিও বোধহয় বাদ দেননি তিনি।'

আবার একটু হাসল জুবের। তারপর বিকিনি পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কে বলুন তো? চেনেন নাকি?'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল ফটোগ্রাফার। 'আরে, চিনতে পারছেন না? ও তো ইফফাৎ সানিয়া। দু'একটা ছবিতে ছোট ভূমিকায় কাজ করেছে, কিন্তু এরই মধ্যে সবাই বলাবলি করছে, ওর হবে। আমারও তাই ধারণা, ও একটা প্রতিভা। শুধু একটা

সুযোগ পেলেই বাজার মাত করে দেবে।'

যা জানার জানা হয়ে গেছে জুবেরের, কাজেই আর কোন উৎসাহ দেখাল না সে। ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনার ক্ষীণ একটা হাসি হেসে কোলের বইটা তুলে নিয়ে পাঠে মন দেবার ভান করল। কিন্তু তবু নড়ার কোন লক্ষণ নেই ফটোগ্রাফারের। খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল সে, 'কিছু যদি মনে না করেন, আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন, মিঃ জুবের?' মুখ তুলে তাকাল জুবের। রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু চেহারায় সদয় আগ্রহের ভাব। 'অনেক চেষ্টা করেও আপনার বাবার একটা সাক্ষাৎ-কার নিতে পারিনি। অথচ তাঁর একটা সাক্ষাৎকার ছাড়া আমা-দের পত্রিকার আগামী সংখ্যাটা কানা হয়ে যাবে। এই কর্মশালার মূল্যায়ন তাঁর মতো আর কারো পক্ষে করা তো সম্ভব নয়। যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন...।'

হাসি মুখেই বলল জুবের, 'আপনি ভুল লোককে ধরেছেন, শফিক সাহেব। বাবার কোন ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। আপনি নুরুল হককে ধরছেন না কেন? বাবার এসব দিকগুলো তো সে ই দেখাশোনা করে।'

'তাকে পেলে তো। এখন আপনিই আমার ভরসা...'

অসহায় দেখাল জুবেরকে। 'জানেনই তো, বাবারা কেমন হয়। আমার কথা তিনি কানেই তোলেন না। সত্যিই আমি দুঃখিত।'

কাল চেহারাটা আরো কাল হয়ে গেল ফটো-জার্নালিস্ট শফি-কের। 'কি যে করি এখন।' স্বগতোক্তির মতো শোনাল কথাটা। 'ঠিক আছে, মিঃ জুবের। ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চলে গেল সে।

বই থেকে মুখ তুলল জুবের। বিকিনি পরা ইফফাৎ সানিয়াকে ছেড়ে ফটোগ্রাফারের দল আরেকটা মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে তাদের দিকে পিছন ফিরল সানিয়া। এগিয়ে এল হোটেল রেনবোর সীমানার মধ্যে। জুবেরের কাছ থেকে মাত্র হাত পাঁচ-ছয় দূরের একটা টেবিল দখল করে বসল সে। এই সময় বেঁটে একটা লোক তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল নেড়ে লোকটা বলল, 'যা আশা করেছিলাম, তাই ঘটেছে, কি বল, সানিয়া? এবার একটু প্রচার হবে তোমার। মনটা খুব খুশি খুশি লাগছে, বুঝলে? সিনেমায় যাচ্ছি, তুমিও যাবে নাকি?'

'আমি বরং আরো খানিকক্ষণ থাকি এখানে,' বলল মেয়েটা।

'ভাল কথা। কিন্তু আবার বলছি, নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কর না। এ বড় কঠিন লাইন, সানিয়া। লোককে ডেকে না দেখালে কেউ তোমাকে দেখবে না। আবার বেহায়ার মতো কিছু করলে হিতে বিপরীত হবে। কাজটা সারতে হবে ইঙ্গিতে। সে যাক। আমি তাহলে ছ টায় তোমার সাথে দেখা করব রেনবোতে?'

কান খাড়া করে ওদের সব কথা শুনল জুবের। চলে গেল লোকটা। বই থেকে মুখ না তুলে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ছোট্ট হাতব্যাগ থেকে পাউডারের কৌটো বের করল মেয়েটা। সত্যি অপরূপ সুন্দরী। লাবেও এই রকম একটা চেহারা দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মনে মনে মেয়েটার রূপের প্রশংসা করল জুবের। এবং সাথে সাথেই মগজের ভেতর আবার শুরু হয়ে গেল সেই আলোড়নটা। আবার শুরু হল সেই পাখি পড়ানো—'এখনই তো সময়! দেরি করছ কেন? কাজটা করার কথা তো অনেক দিন থেকেই ভাবছ। এমন সুযোগ আর পাবে? সেরে ফেল তাহলে। মারতেই যদি চাও,

এর চেয়ে ভাল শিকার আর তুমি পাবে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার তো কোন মানে হয় না। ভেবে দেখ, তোমার এই কাজের জন্যে মেয়েটা সব দিক থেকে উপযুক্ত। ইচ্ছে করলেই তোমার হোটেল রুমে নিয়ে যেতে পার ওকে। সিনেমা দেখে ওরা ফিরে আসার আগে দু'ঘণ্টা সময় আছে তোমার হাতে। কাজটা সেরে সব ঠিক ঠাক করতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগবে না।'

চারদিকে তাকাল জুবের। হোটেলের সীমানায় লোকজন তেমন নেই বললেই চলে। মাত্র চারটে টেবিলে লোক আছে, তার মধ্যে দুটো টেবিল দখল করে রেখেছে সে' এবং সানিয়া। বাকি দুটো টেবিলের একটায় বসে আছে একাকী একজন প্রৌঢ়, আরেকটা দখল করে রেখেছে অল্প-বয়েসী একটা দম্পতি। প্রৌঢ় লোকটাকে বিষণ্ণ, মনমরা দেখাচ্ছে, আর দম্পতিটা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কেউ ওর বা সানিয়ার দিকে তাকিয়ে নেই।

কাজটা করবে কি করবে না সে-ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন বোধ করল না জুবের। সেটা যেন অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে। শুধু ঠিক করল : এই মেয়েটাকেই। এবং আজই।

সহজ শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল জুবের। হার্টবিট একটু বেড়ে গেছে, তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না নিজের মধ্যে।

জিভের ডগা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে লিপস্টিকের রঙ ঠিক করে নিচ্ছে মেয়েটা, তাকিয়ে আছে পাউডার কৌটার ছোট্ট আয়নার দিকে। তার সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। 'আপনি···মিস ইফফাৎ সানিয়া?'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল মেয়েটা। মুখ তুলে তাকাল। সুদর্শন এক যুবককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরমুহূর্তে মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। 'জী। আপনি···টি আলম সাহেবের

ছেলে জুবের আলম, তাই না?'

'হ্যাঁ,' একগাল হাসল জুবের। 'সুযোগ্য পিতার অযোগ্য পুত্র। আজ সকালেই আপনার কথা বলছিলেন বাবা।'

'তাই।' অবাক বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সানিয়ার।

'বাবা আপনার সাথে কথা বলতে চান,' বলল জুবের। 'বললেন, সানিয়াকে খুঁজে বের করে আজকের মধ্যেই নিয়ে আসবে আমার কাছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অগত্যা তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়েছি। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। তেমন খোঁজাখুঁজি করতে হল না...'

এক এক করে অবিশ্বাস, বিস্ময় এবং উত্তেজনার ছায়া পড়ল সানিয়ার চেহারায়। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কৌতুক বোধ করল জুবের।

'সত্যি।' শিশুর মতো আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ল সানিয়া। 'সত্যি উনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন? আপনি ঠাট্টা করছেন না তো...মানে...'

'এতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে,' বলল জুবের। 'আপনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন বাবা, কাজে লাগিয়ে সেটা পরখ করতে চান, সেজন্যেই ডাকা। হাতে যদি তেমন কোন কাজ না থাকে, এখুনি চলুন না আমার সাথে। গেলেই বুঝতে পারবেন, ঠাট্টা করছি কিনা।'

'না-না, ঠাট্টা করার কথাটা আমি এমনি বলে ফেলেছি,' তাড়াতাড়ি বলল সানিয়া। 'কিন্তু এখনই? কোথায়?' উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে তার। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি থেকে অবিশ্বাসের ভাবটুকু এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। এত বড় সৌভাগ্য। টি আলমের মতো ব্যক্তিত্ব

তাকে কাজের জন্যে ডেকেছে—বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি।

মেয়েটা ভারি বোকা, ভেবে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল জুবের। এই রকম একটা হাবা মেয়েকে মুঠোয় ভরা তার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। 'এই হোটেলেই···রেনবোর তিন তলায় উঠেছি আমরা,' বলল সে। 'আপনার সম্পর্কে বাবা কি বলছিলেন, জানেন? বলছিলেন, মেয়েটা একটা গুপ্তধন, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি।' হো হো করে হেসে উঠল সে। 'মানে হল, আপনি একটা প্রতিভা। প্রায় কোন ব্যাপারেই বাবার সাথে আমার মতের মিল হয় না—কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তাঁর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

একটু বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, সানিয়াকে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবল জুবের। প্রথম পরিচয়ে এতটা প্রশংসা করে না কেউ। নিজেকে তিরস্কার করল সে। কে জানে, মেয়েটা হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

ঠিক সন্দেহ নয়, অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করছে সানিয়া। খুব ইচ্ছে করল, জুবেরের চোখ দুটো একবার দেখে। কিন্তু নীল কাঁচের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে সে দুটো। ছেলেটার হাসিটাও কেমন যেন। বড় বেশি স্বাভাবিক, বড় বেশি উষ্ণ আন্তরিকতার ছোঁয়া। তারপর ভাবল, আসলে এসব তার সন্দেহপ্রবণ মনের বিকার। টি আলম সত্যিই যদি তার সাথে দেখা করতে চেয়ে থাকেন, এর চেয়ে খুশির কথা আর কিছু হতে পারে না। কক্সবাজারে আসা সার্থক তার। মনে পড়ল, শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা খরচ হবে ভেবে এখানে আসতেই চায়নি সে। এখন যার কাছে আছে সে, যাকে অভিভাবক ধরেছে, সেই মাহবুব হোসেনই জোর-জার করে নিয়ে এসেছে তাকে।

আসার আগে বলেছিল, 'বলা যায় না. বিখ্যাত কারো চোখে পড়েও তো যেতে পার।' কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারে সানিয়া, কথাটা বলার সময় এতটা কল্পনাও করেনি মাহবুব ভাই। টি আলম তার সাথে দেখা করতে চাইবেন, এ ভাবাই যায় না। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তাই ঘটছে। এতবড় একজন লোকের ছেলে তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, একঘণ্টা আগে টি আলম আর তাঁর স্ত্রী জেসমিনকে সিনেমায় যেতে দেখেছে সে। 'কিন্তু এখন তো তিনি সিনেমায়।'

উত্তরটা যেন মুখে যোগানই ছিল, সাথে সাথে হেসে উঠে বলল জুবের, 'এসব ছবি কোনটাই শেষ পর্যন্ত দেখেন না বাবা।' রিস্ট-ওয়াচ দেখল সে। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন হোটেলে। আবার সাড়ে চারটের সময় এক জায়গায় যাবার কথা ঠিক হয়ে আছে। আধ ঘণ্টা সময় পাচ্ছি আমরা, এই সুযোগে ইচ্ছে করলে তাকে আপনি ধরতে পারেন। অবশ্য আপনার যদি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে তাহলে আলাদা কথা…'

'না-না,' ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল সানিয়া। 'কোন কাজই নেই আমার। তাছাড়া, কাজ থাকলেই বা কি, আপনার বাবা যখন ডেকেছেন, সব ফেলে তাঁর সাথে দেখা করা উচিত আমার। এত বড় একজন গুণী মানুষ ··এ তো আমার সৌভাগ্য…'

'রেনবোতেই উঠেছেন নাকি?' জানতে চাইল জুবের। 'পোশাক পাল্টাতে হলে আর দেরি করা উচিত হবে না…'

'পাশেই, হোটেল মৌচাকে উঠেছি' তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নিল সানিয়া। 'পোশাক পাল্টাতে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার। আপনি কি…?'

সানিয়াকে কথা বলতে দিল না জুবের, বলল, 'তার আগে আর একটা কথা বলে নিই। বাবার মেজাজের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন? খেয়ালী মানুষ, কখন কি করে বসেন তার ঠিক নেই। যতদূর বুঝতে পারি, আপনাকে নিয়ে বিরাট একটা পরিকল্পনা আছে তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে, বলা মুশকিল। এত কথা বলে আসলে আমি কি বোঝাতে চাইছি ধরতে পারছেন তো? আপনি যে বাবার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, সে- কথা এখুনি কাউকে না জানানই ভাল।'

ব্যাপারটা সাথে সাথে বুঝল সানিয়া। সত্যি কথাই বলেছে জুবের। সবাই যদি জানতে পারে যে টি আলম উপযাচক হয়ে সানিয়ার সাথে দেখা করেছেন, অথচ শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি কোন কাজ দেননি, সেটা ভবিষ্যতের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। 'ঠিক আছে, কাউকে কিছু বলব না,' মুখ টিপে হাসল সে। 'এমন কি আমার পার্সেন মাহ-বুব ভাইকেও না। কাজটা যদি পাই, ওকে তাহলে খুব চমকে দেয়া যাবে। সাতাশ নম্বর স্যুইট তো? ঠিক চারটের সময় পৌঁছে যাব। চলি তাহলে?'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল জুবের। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল সানিয়া। ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির এক ফালি হাসি ফুটল জুবেরের ঠোঁটে। সহজেই রাজি করানো গেছে মেয়েটাকে। একটা সিগারেট ধরাল সে। সানিয়ার চেয়ারটায় বসল। এখন দরকার একটা পরিকল্পনা। মানুষ খুন করার পরিকল্পনা, কাজেই প্রথম শর্ত সেটাকে নিখুঁত হতে হবে। চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে, হঠাৎ করেই যেন অস্বাভাবিক পরিষ্কার হয়ে গেছে তার মাথাটা। প্রতিটি বিষয়ে চটপট সিদ্ধান্ত নিতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। প্রথমেই ঠিক করল, কাজটা হোটেলের রুমেই সারতে হবে। তার

মানে, রক্ত পড়লে চলবে না। ধস্তাধস্তি বা চিৎকার হওয়া চলবে না। মনের ভেতর থেকে কেউ যেন সাহায্য করছে ওকে। কি ভাবে কি করা যায় ভাবছে, এই সময় মনে পড়ে গেল, ওদের স্যুইটের লাউঞ্জে জানালাগুলো বড় বড়, সবগুলোয় পর্দা টাঙানো আছে। প্রতিটি পর্দার সাথে আছে সিল্কের রশি। একটা রশি দিয়ে ফাঁস তৈরি করা এমন কি আর কঠিন কাজ। আর সেই ফাঁসটাকে সানিয়া চেঁচিয়ে ওঠার আগেই টেনে দেয়াও খুব সহজ। পুলক অনুভব করছে সে। একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

আঙুলে টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল জুবের। শুধু চ্যালেঞ্জ নয়, কাজটা করার মধ্যে যেটুকু রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা আছে সেটুকু এখন তার একান্তভাবে দরকার বলে অনুভব করছে সে। বুঝতে পারছে, পরিকল্পনা তৈরির মধ্যে যতই পুলক থাকুক, আসল উত্তেজনা শুরু হবে মেয়েটাকে খুন করার পর থেকে। যখন তার হাতে থাকবে একটা লাশ। কঠিন সমাস্যাটাও দেখা দেবে কেবল তখনই। কতটা কৌশলী সে, তার উদ্ভাবনী শক্তি কতটা ধারাল, ঘটে কতটা বুদ্ধি, এসবেরই পরীক্ষা শুরু হবে তখন। কোথাও একটু ভুল করলেই হেরে যাবে সে। খপ করে ধরে ফেলবে পুলিশ।

চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে হোটেলে ফিরে এল সে। রিসেপশনে একজন কেরাণী বসে ছিল, তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তিন তালায় উঠে এল। হোটেল রেনবোর গোটা তিন তালা-টাই কর্মশালায় আমন্ত্রিত বড় বড় ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষভাবে সং-রক্ষিত। লম্বা করিডোরে কাউকে দেখল না জুবের। সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। মস্ত লাউঞ্জ, বিরাট ডাইনিং হল আর তিনটে রাজকীয় বেডরুম ছাড়াও

এই স্যুইটে রয়েছে সংলগ্ন বাথ, ছোট্ট একটা কিচেন এবং ফুল-বা-রান্দা। নামী-দামী মেহমানরা থাকবেন বলে তিন তালার প্রতিটি স্যুইটের ফার্ণিচার নতুন করে সাজান হয়েছে।

লাউঞ্জের একটা জানালার সামনে দাঁড়াল জুবের। পর্দাগুলো ঘিয়ে রঙের। সিল্কের রশিগুলো টকটকে লাল। একটা রশি খুলে আঙুলে পেঁচিয়ে নিল সে। তারপর কি মনে করে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে দাঁড়াল। আঙুল থেকে লাল রশিটা খুলে একটা বালিশের তলায় রেখে দিল সেটাকে।

লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে রিস্টওয়াচ দেখল জুবের। আর এক মিনিট বাকি। মনে মনে ছোট্ট একটা হিসেব করল সে। আর পাঁচ মিনিট পর মারা যাবে সানিয়া। একটা ঢোক গিলল জুবের। উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের আশায় জলজল করে উঠল চোখ দুটো। বুকে একটা হাত রাখল সে। ধুকপুক করছে ভেতরটা। বেড়ে যাচ্ছে হার্টের গতি, পরিষ্কার অনুভব করল সে। এই তো, এতদিনে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে সে বেঁচে আছে। নিজেকে তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হল।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল জুবের আলমের ঠোঁটে। দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ভারতীয় ডকুমেন্টারী, দেখতে ভাল লাগছে না জেসমিন আলমের। এর চেয়ে সৈকতে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে সাগরে সাঁতার কাটা ঢের ভাল। আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকাল সে। গভীর ধ্যান-মগ্নতার সাথে ছবিটার সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছেন টি আলম। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে উসখুস করতে শুরু করল সে। কিন্তু কাজ হল

-না তাতে। মুখ খুলতে যাবে, এই সময় পাশ থেকে টি আলম বললেন, 'বুঝতে পারছি, ছবিটা ভাল লাগছে না তোমার। তা কি করতে চাও?' অন্ধকারে মৃদু হাসলেন তিনি। 'সাগর বোধহয় ডাকছে তোমাকে, তাই না? কিন্তু আমার তো এ ছবি না দেখলেই নয়।'

স্বামীর হাত ধরে মৃদু একটু চাপ দিল জেসমিন। 'তুমি কত ভাল! আমার মনের কথা কি করে যে টের পেয়ে যাও?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' ছবির দিকে আবার মন দিয়ে বললেন টি আলম, 'যা ভাল লাগে করগে। তোমার ছুটি।'

স্বামীকে মত বদলাবার সুযোগ না দিয়ে সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল জেসমিন। হল থেকে বেরিয়ে সামান্য একটু পথ হেঁটেই চলে এল। হোটেলে ঢুকে রিসেপশনে থামল ও। কিন্তু চাবি চাইতে কেরাণী লোকটা বলল, 'চাবি তো মিঃ জুবেরের কাছে, ম্যাডাম। এই তো খানিক আগে ফিরেছেন তিনি।'

সিঁড়ির দিকে না গিয়ে সোজা লিফটে চড়ল জেসমিন। তিন তালায় উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল দেয়াল-ঘড়িটা। চারটে সাত। সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়াল সে। টোকা দিল। 'জুবের!'

ভেতর থেকে সাড়া দিল না জুবের। 'দরজা খোল! জুবের!'

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল জেসমিন। তবু কোনো সাড়া নেই। 'কি হল, জুবের?' গলা চড়াল সে। দুম দুম করে ঘুসি মারল দরজার গায়ে। 'জুবের! জুবের!'

চেঁচামেচি শুনে ছুটে এল একজন রুম-বয়। 'তোমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে?' জানতে চাইল জেসমিন। 'না থাকলে রিসেপশন থেকে নিয়ে এস···আমার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে···'

'চাবি আমার সাথেই আছে, ম্যাডাম,' পকেট থেকে চাবি বের

করে দরজার তালা খুলে দিল রুম-বয়। ভেতরে ঢুকে ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল জেসমিন।

ঘুরে দাঁড়াতেই নাকের ফুটো দুটো কুঁচকে উঠল তার। অপরিচিত সেন্টের গন্ধ। ব্যাপারটা কি? ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠতে শুরু করল। জুবের কি কোন মেয়েকে নিয়ে এসেছে...ছি, না, তা কি করে হয়। কিন্তু তা যদি না হয়, সেন্টের গন্ধ ভাসছে কেন বাতাসে? 'জুবের?' হঠাৎ উঁচু গলায় ডাকল জেসমিন।

পায়ের আওয়াজ। জুবেরের বেডরুম থেকে আসছে। তারপর ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিল জুবের, তারপর অত্যন্ত সাবধানে বেরিয়ে এল বাইরে। হাত দুটো পিছন দিকে চলে গেল। আবার বন্ধ করে দিল দরজাটা। কেমন যেন চোরের মতো দেখাচ্ছে তাকে। এখনও পরে রয়েছে সানগ্লাসটা। ঘরের ভেতর ওই সানগ্লাস পরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না জেসমিন। নীল কাঁচ দুটোকে নিরেট একটা পাঁচিল বলে মনে হয় তার। জুবের কি ভাবল, তার কথা শুনে কি প্রতিক্রিয়া হল, কিছুই বোঝা যায় না। সেটা বড় অস্বস্তিকর লাগে জেসমিনের

বরাবরের মতো ভাবলেশহীন দেখাল জুবেরকে। কিন্তু নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম দৃষ্টি এড়াল না জেসমিনের।

'কি ব্যাপার?' আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল জুবের। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?'

'এতক্ষণ ধরে নক করলাম, শুনতে পাওনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল জেসমিন। 'কি করছিলে তুমি?'

জেসমিনের চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখেও চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া হল না জুবেরের। আরো দু'পা এগিয়ে এল সে।

জেসমিনের মনে হল, বেডরুমের দরজা আর তার মাঝখানে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে জুবের। 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছিল বটে কি যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু, তুমি যে ফিরে এসেছ তা আমার একবারও মনে হয়নি।'

সিগারেট কেস বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরতে যাবে জুবের, তার লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলোর ওপর চোখ আটকে গেল জেসমিনের। তিনটে আঙ্গুলে লাল দাগ, একটা থেকে এখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে। 'তোমার আঙ্গুল কাটল কিভাবে?'

'আঁচড়ে দিয়েছে···'

'আঁচড়ে দিয়েছে?' জেসমিনের চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল। 'কে আঁচড়ে দিয়েছে?'

'বিড়াল। কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছিল বারান্দায়।'

তাচ্ছিল্যের সাথে কাঁধ ঝাঁকাল জেসমিন। বুঝিয়ে দিল, এই জঘন্য মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করেনি সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। কি বলা যায় ভাবছে। সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, স্যুইটে মেয়ে নিয়ে এসেছে কেন? উঁহুঁ, সেটা উচিত হবে না। তার ধারণা ভুলও তো হতে পারে। বরং সব কথা ওর বাবাকে জানানটাই ভাল হবে। যার ছেলে সেই বুঝবে।

'বাবা কোথায়?'

'সিনেমা দেখছে,' বলল জেসমিন। 'আমার ভাল লাগছিল না বলে চলে এসেছি। এমন জানলে আসতাম না···' রাগের সাথে জানালার পর্দাটা টেনে দিতে গেল সে। ঝুপ করে পড়ে গেল সেটা। ঝুঁকে পড়ে পর্দাটা তুলে নিয়ে দেখল, পর্দার সাথে রশিটা নেই।

'কিছু খুঁজছ নাকি?' সেই ঠাণ্ডা হিম গলায় জানতে চাইল জুবের।

ঘট করে ঘুরল জেসমিন। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জুবেরের মুখে এখনও মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। এ এক অদ্ভুত হাসি। কৃত্রিম অর্থহীন।

'পর্দার একটা রশি···গেল কোথায় ?'

'কি নম্বর। এত কিছু দেখতে পাও ?' ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে রশিটা বের করে মুখের সামনে দোলাতে শুরু করল জুবের। 'দেখ তো এটা কিনা ? খুলে নিয়ে খেলছিলাম একটু···'

'কি বললে ?' জুবেরের বিশ্রী অট্টহাসটা শুনে রাগে সারা শরীর রী রী করে উঠল জেসমিনের।

'বড় একঘেয়ে লাগছিল কিনা, কেউ ছিলও না যে কথা বলব, তাই এটা নিয়ে ছেলেখেলা করছিলাম···'কথা বলার মধ্যেই ধীর কিন্তু দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল জুবের। রশি ধরা হাত দুটো মুখের সামনে থেকে নামায়নি এখনও। হঠাৎ লক্ষ্য করল জেসমিন, রশির মাথায় একটা ফাঁস রয়েছে।

কেন যেন হঠাৎ ভয় লাগল জেসমিনের। যেমন যেন চোরের মতো সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে জুবের। ও কি তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে নাকি ? যেন কিছুই টের পায়নি যেন ভয় পায়নি, এই রকম একটা ভাব করে জানালার সামনে থেকে সরে গেল জেসমিন। দু'জনের মাঝখানে একটা টেবিল পড়ল এখন। তবু একটা আড়াল পাওয়া গেল। সহজাত প্রবৃত্তির বশে বুঝতে পারছে সে, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে এখানে। অচেনা সেন্টের গন্ধ, আঙুলের চামড়া ছড়ে যাওয়ার দাগ, রশির ফাঁস, জুবেরের এগিয়ে আসার ভঙ্গি, মুখে স্থির হয়ে থাকা অর্থহীন হাসি—এসবের যে কি মানে, কিছুই বুঝতে পারল না জেসমিন। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল সে। 'জুবের।' হঠাৎ ফিসফিস করে জানতে

চাইল সে, 'তুমি…তুমি কি এখানে কোন মেয়েকে…মানে…জুবের ?' নিজের কানেই কণ্ঠস্বরটা বড় বেশি কঠিন শোনাল।

জেসমিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি জুবের। এখনও তার মুখে সেই অর্থহীন হাসিটা লেগে রয়েছে। এখনও সে ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। রশির একটা প্রান্ত ছেড়ে দিল সে। লাল একটা পেণ্ডুলামের মতো তার মুখের সামনে দুলছে সেটা।

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না ?' নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল জেসমিন।

'আশ্চর্য তো !' বলল জুবের। 'তুমি জানলে কিভাবে ? ঠিক ধরেছ।' বেডরূমের দিকে একটা আঙুল তুলল সে। 'তোমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই…এখনও আছে মেয়েটা, আমার বেডরূমে…' বোকা বোকা অর্থহীন হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এখনও এগিয়ে আসছে সে।

দুই

দশ বছর আগে পত্রিকা সম্পাদকরা মনে করত, সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার হিসেবে শফিকুর রহমান বাবুর তুলনা হয় না। ঝর ঝরে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে পারত সে, ফটো তোলায়ও হাত ছিল দারুণ। সম্মান এবং টাকা, দুটোই প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিল সে।

এক রাতে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ডিনার পার্টি থেকে বাড়ি ফিরল

শফিক। মদ খেয়েছিল সে, একটু বেশিই খেয়েছিল—এই মদই তার কাল হল। গাড়ি থেকে নেমে গ্যারেজের দরজা খুলতে চলে গেল তার স্ত্রী, এই সময় ক্লাচের ওপর থেকে সরে গেল শফিকের পা। গ্যারেজের দরজাটা তখনও খোলা হয়নি, সেই বন্ধ দরজার সাথে ওর স্ত্রীকে পিষে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিল গাড়িটা। সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হল শফিকুর রহমান বাবুর পতন। আগে শখ করে মদ খেত, এরপর খেতে শুরু করল স্ত্রীকে ভুলে থাকার জন্যে। মাতাল হিসেবে কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল তার। হাতের লেখা, কাটো তোলার হাত—ই হয়ে গেল। তাকে দিয়ে যে আর কিছু হবে না তা অচিরেই বুঝতে পারল সম্পাদকেরা। চাকরি হারাল শফিক, অন্যান্য রোজগারের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল তার।

এখনকার শফিককে দেখে দশ বছর আগের শফিককে চেনার কোন উপায় নেই। কাউকে তোয়াক্কা করার বান্দা ছিল না সে। শফিক সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে সিনেমা জগতের হোমরাচোমরা লোকেরা গর্ব অনুভব করত। অথচ এখনকার অবস্থা ঠিক তার উল্টা। পাঁড় মাতালটাকে এড়িয়ে চলতে পারলে সবাই বাঁচে

চল্লিশ বছর বয়েসেই বুড়ো হয়ে গেছে শফিক। গায়ে মাংস নেই বললেই চলে, আর রঙটা রোদে পুড়ে আরো কাল হয়ে গেছে। ঢাকার বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত বিকৃতরুচি এক লোকের সম্পাদনায় ‘সকাম’ নামে যে অশ্লীল যৌন তথা সিনেমা পত্রিকাটা বের হয়, শফিক সেটার নিজস্ব প্রতিনিধি। মদ কেনার জন্যে টাকা দরকার বলেই চাকরিটা করে শফিক।

টি আলমের ছেলে মুবের আলমের সাথে কথা বলে মনে মনে নিরাশ হল শফিক। বড় লোকদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা, বাপকে

একটু বলে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতেও রাজি নয়। বিড় বিড় করতে করতে হোটেল রেনবোয় ঢুকল সে। 'সকামে'র সম্পাদক খুড়ো অ্যাডভোকেট জহির নিযাম কড়া ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছে, টি আলমের সাক্ষাৎকার তো চাই-ই, সেই সাথে তাঁর পরিবার সম্পর্কে বাজারে যে-সব গুজব আছে সে সম্পর্কেও মুখরোচক তথ্যনির্ভর খবর সংগ্রহ করতে হবে। শফিক জানে, টি আলমের সাক্ষাৎকার নিতে ব্যর্থ হলে তার চাকরি এবার নাও থাকতে পারে। আর 'সকাম' থেকে চাকরি গেলে অন্য কোথাও সুবিধে করতে পারবে না সে। মদ খাওয়ার পয়সা তো জুটবেই না, সেই সাথে অনাহারে মরতে হবে।

গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে হোটেল রেনবোর লবিতে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করল শফিক। তারপর রিসেপশনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টুক করে এক ফাঁকে ঢুকে পড়ল লিফটে। তিন তলায় চলে এল সে। সাতাশ নম্বর স্যুইটের প্রায় সামনেই, উল্টোদিকে, একটা ঝুল-বারান্দা আছে, কিন্তু ওদিকে যাবার দরজাটা দেখে মনে হয় ওটা বোধহয় আরেকটা করিডোরে যাবার পথ। ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাথার ওপর একটা খিলান দেখল শফিক। রেইলিঙে পা দিয়ে সেটার ওপর উঠে বসল সে। চমৎকার জায়গা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনেটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু ওদিক থেকে সহজে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। মন স্থির করে ফেলেছে, টি আলমকে একবার শুধু দেখতে পেলে হয়, লাফ দিয়ে নেমে সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলার-চেষ্টা করবে সে। সাতাশ নম্বর স্যুইটের মাথায় করিডোরের দেয়ালে ঝুলছে মস্ত একটা ওয়াল-ক্লক। চারটে বাজতে আট মিনিট বাকি।

পায়ের আওয়াজ। পরমুহূর্তে করিডোর ধরে জুবের আলমকে

এগিয়ে আসতে দেখল শফিক। নিজেদের স্যুইটের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। হঠাৎ খেয়ালের বশেই, কি করছে তা ভাল করে না বুঝেই, ক্যামেরাটা তুলে শাটার টিপে দিল শফিক। আপনমনে হাসল সে। পত্রিকার পাঠকরা একটু হয়ত অবাক হবে টি আলমের ছেলের ছবি দেখে, কিন্তু সেই সাথে খুশিও হবে তারা। বিখ্যাত লোকদের ছেলে-বউ সম্পর্কেও তাদের উৎসাহ কম নয়।

দরজার তালা খুলল জুবের। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার। পকেট থেকে মৃত-সঞ্জীবনীর আধ খালি একটা বোতল বের করল শফিক। খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে বোতলটা আবার রেখে দিল পকেটে। সিগারেট ধরাতে গিয়েও কি মনে করে ধরাল না সে। ধোঁয়ার গন্ধে এদিকে যদি বয়-বেয়ারা বা আর কেউ তাকায়, ধরা পড়ে যাবে সে। ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। থিলানটা বেশ চওড়া, সাক্ষাৎকার নেয়া কপালে থাকুক বা না থাকুক খানিকক্ষণ অন্ততঃ বিশ্রাম তো নেয়া যাবে! আরেকবার বোতলটা বের করতে যাবে, এই সময় চোখে পড়ল করিডোর ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে একটা মেয়ে, কাছে আসতেই তাকে চিনতে পারল সে। রীতিমতো অবাক হয়ে গেল মেয়েটাকে সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়াতে দেখে এই ইফফাৎ সানিয়ার কথাই তো জিজ্ঞেস করছিল তাকে জুবের। তার মানে, ওদের মধ্যে পরিচয় নেই।

নীল পরীর মতো দেখাচ্ছে সানিয়াকে। বাদামী গলায় সুন্দর নীল পুঁতির একছড়া মালা পরেছে সে। মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, গরম একটা খবর তৈরি হতে যাচ্ছে। স্যুইটের দরজায় টোকা দিতে যাচ্ছে সানিয়া, ঠিক এই

সময় তার ছবি তুলে নিল শফিক। টোকার শব্দে চাপা পড়ে গেল ক্যামেরার ক্লিক। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল জুবের আলম। সানিয়াকে দেখে একগাল হাসল।

বলল, 'আসুন, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাবা।'

স্যুইটে ঢুকল সানিয়া। ভেতর থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি শফিক। বাবা অপেক্ষা করছেন মানে? ডাহা মিথ্যে কথা। টি আলম এখন সিনেমা দেখছেন। ছ'টার আগে ফেরার কোন সম্ভাবনাই নেই তাঁর। তাহলে? ব্যাপারটা কি? সুন্দর, নম্র জুবের আলমকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না—তবে কি ওর ভেতর অন্য কিছু লুকিয়ে আছে? মিথ্যে কথা বলে মেয়েটাকে ঘরে আনল কেন? তবে কি মেয়েটাকে এই মুহূর্তে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে জুবের আলম?

ঘামতে শুরু করল শফিক। কি করবে ভেবে পেল না। করিডোরে নেমে দরজায় কান পাতবে? নাকি এখানেই অপেক্ষা করবে? মেয়েটা হয়ত চিৎকার করে উঠবে···তা যদি ওঠে, দরজায় ধাক্কা দেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে সে। হয়ত ভেতরে ঢুকে দেখবে উলঙ্গ হয়ে মেয়েটার সাথে ধস্তাধস্তি করছে ছোকরা···

ঠিক এই সময় করিডোর ধরে আরেকজনকে আসতে দেখল শফিক। এইবার! এইবার জমবে খেলা! জুবেরের সৎ মা এসে পড়েছে! মিসেস জেসমিন!

সাতাশ নম্বর দরজার সামনে দাঁড়াল জেসমিন। টোকা দিল দরজায়। 'জুবের!'

ক্লিক করে উঠল শফিকের ক্যামেরা।

ঠিক এই রকম একটা উত্তেজনাকর কিছু ঘটুক, মনে মনে সেটাই চাইছিল জুবের। অপ্রত্যাশিত ভাবে জেসমিন এসে পড়ায় হার্টবিট বেড়ে গেল তার, গরম হয়ে উঠল সারা শরীর। বুকটাও ধড়ফড় করছে—এসবই উপভোগ্য মনে করল সে। এখন আর সামনে এগোচ্ছে না, কিন্তু মুখের সামনে পেণ্ডুলামের মতো দোলাচ্ছে লাল রশিটা। জেসমিন ভয় পেয়েছে দেখে আত্মবিশ্বাসও ফিরে এসেছে তার মধ্যে। ওর মতো সাত ঘাটের পানি খাওয়া একটা মেয়েকে ভয় পাইয়ে দেয়া সহজ নয়। এখন ওকে ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে। ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে হবে, মেয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারটা ও যেন বাবাকে না জানায়।

'জুবের!' অবিশ্বাসে বেসুরো শোনাল জেসমিনের কণ্ঠস্বর। 'এসব কি বলছ তুমি? তুমি··· তুমি এখানে মেয়ে নিয়ে এসেছ?'

উত্তর না দিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল জুবের। মাথার পেছনটা চুলকাল এক হাতে। তারপর আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল জেসমিনের দিকে। 'স্বীকার করছি, অন্যায় হ'য়ে গেছে। আমি দুঃখিত, জেসমিন।'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে জেসমিন। ভাবছে, তার মানে জুবেরের ঘরে এখনও আছে মেয়েটা?

দরজায় নক শুনে মুহূর্তের জন্যে ঘাবড়ে গিয়েছিল জুবের। লাউঞ্জের সোফায় বসে লাল রশিটা সানিয়ার গলা থেকে খুলছিল তখন ও। নক শুনেই ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল বুক। আতংকে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়েছিল ও। আগে থেকেই জানত, অপ্রত্যাশিত বিপদের সামনে তাকে পড়তেই হবে। মজাটাই তো ওখানে। সব কিছু যদি তার অনুমান

আর হিসেব মতো ঘটে, তাহলে আর রোমাঞ্চ থাকল কোথায়। লাশটা তুলতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে তাকে। এত ভারি হবে সানিয়া, ভাবতেই পারেনি। অনেক কষ্টে তাকে কাঁধে তুলে বেড-রুমে নিয়ে আসে, বিছানার ওপর শুইয়ে দেয়। এরপর লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে সোফা থেকে তুলে পকেটে ভরে লাল রশিটা। এই সময় চোখে পড়ে মেঝেতে নীল পুঁতি ছড়িয়ে রয়েছে। সানিয়ার গলায় ছিল মালাটা, নিশ্চয়ই ছিঁড়ে গেছে ধস্তাধস্তির সময়। একটা একটা করে কুড়িয়ে নিল পুঁতিগুলো। বেশ বড় আকার, ছোট আখ-রোটের মতো এক একটা। শেষ পুঁতিটা সোফার তলা থেকে তুলে নিয়েছে, এই সময় দরজার তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ ঢুকে-ছিল তার কানে। দ্রুত নিজের বেডরুমে গিয়ে ঢুকেছিল সে, দরজা বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।

'ছি, ছি,' ফিসফিস করে বলল জেসমিন। 'এমন একটা নোংরা কাজ করতে পারলে তুমি?'

'বললাম তো, দুঃখিত,' মিন মিন করে বলল জুবের। 'হঠাৎ কি যে হল, নিজেকে চেক করতে পারলাম না।' লাল রশিটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিল, এগিয়ে এসে বসল একটা আরাম চেয়ারের হা-তলে। 'আমি যে কতটা নিঃসঙ্গ, সে তো তুমি বুঝবে না, জেসমিন,' করুণা আদায়ের চেষ্টা করল সে। 'ছোটবেলা থেকে আমি একা। বাবা আমার কথা মনেও রাখেন না। মেয়েটাকেও আমার খুব একাকী আর নিঃসঙ্গ মনে হল, সেজন্যেই নিয়ে এলাম ওকে। ভাব-লাম, গল্প করে কিছুটা সময় কাটাব। কিন্তু···স্বীকার করছি, ওকে আমি চিনতে পারিনি। এখানে আসার পর ওর হাবভাব বদলে গেল। টাকা চাইল। চেঁচামেচি করবে বলে ভয় দেখাল।' লক্ষ্য

করল জুবের, আগ্রহের সাথে ওর কথা শুনছে জেসমিন। ভয় ভয় ভাবটা মিলিয়ে গেছে চেহারা থেকে। এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল, চিবুকটা হাতের তালুর ওপর। 'সত্যি, কাজটা মস্ত অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু…'

'ঠিক আছে, যা হবার হয়েছে…' শাসনের সুরে কথাটা বললেও, খানিকটা সদয় সহানুভূতির ভাবও প্রকাশ পেল জেসমিনের কণ্ঠস্বরে।

তাকে বাধা দিয়ে বলল জুবের, 'ঠিক করলাম, কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে মেয়েটাকে তাড়াতে হবে। চেঁচামেচি করলে…'

'তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না?' জুবেরের বেডরুমের দিকে তাকাল জেসমিন।

অভয় দিয়ে একগাল হাসল জুবের। 'সে-ভয় কর না। মুখে তুলো গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি বাথরুমে—চেঁচাবে, তার কোন উপায় নেই।'

'বল কি!' আঁতকে উঠল জেসমিন। 'এই রকম পাগলামি কেউ করে!'

হঠাৎ চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠল জুবেরের। 'কি বললে? আমি পাগল?'

'না-না, মানে…' জুবেরের অগ্নিমূর্তি দেখে আবার ভয় পেল জেসমিন। 'আমি বলতে চাইছি, এই রকম বোকামি করা উচিত হয়নি তোমার। যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে, এরকম আর যেন কখনও না হয়।' ঘুরে দাঁড়াল সে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। 'আমি এখন সাঁতার কাটতে যাব। যাই, সুইমিং কস্টিউমটা নিয়ে আসি।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, জেসমিন,' পিছন থেকে বলল জুবের।

'কিন্তু একটা কথা, বাবাকে বলে দেবে না তো?'

ঘুরে দাঁড়াল জেসমিন। কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখ পড়ল টেবিলের নিচে নীল একটা পুঁতি পড়ে রয়েছে। ঝুঁকে পড়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। 'কার এটা? কোত্থেকে এল?'

এগিয়ে এসে জেসমিনের হাত থেকে পুঁতিটা নিল জুবের। 'বাহ, সুন্দর দেখতে তো! কি জানি কার। তোমার নয় তো?'

'না।'

'তাহলে বোধহয় ওই মেয়েটারই। যেভাবে হোক পড়ে গেছে।' জেসমিনকে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের পকেটে অন্যগুলোর সাথে পুঁতিটা রেখে দিল জুবের। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, জেসমিন চলে গেলে লাউঞ্জটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। ওর হাতে আঁচড়ের দাগ, তারপর এই পুঁতি দেখে কি ভাবছে জেসমিন কে জানে। 'বাবার কানে যেন এসব কথা না ওঠে।'

নিজের ঘরে চলে গেল জেসমিন, একটু পরই সুইমিং কস্টিউম নিয়ে ফিরে এল সে। ভুরু কুঁচকে জুবেরের কামরার দিকে তাকাল একবার। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। তোমার বাবাকে কিছু বলব না আমি।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত বেরিয়ে গেল স্যুইট থেকে। অনেকটা যেন পালাবার ভঙ্গি।

দরজা বন্ধ করে রিস্টওয়াচ দেখল জুবের। সাড়ে চারটে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আর মাত্র একটা পুঁতি আবিষ্কার করল সে। লাউঞ্জে আর কোন পুঁতি না পেয়ে বিরাট একটা স্বস্তি বোধ করল। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পর্দায় লাগিয়ে দিল লাল রশিটা। তারপর চারদিক থেকে খুঁটিয়ে দেখল লাউঞ্জটাকে। না, কোথাও কিছু খাপছাড়া লাগছে না। বোঝার কোন উপায় নেই যে একটু আগে এখানে

একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

সিগারেট ধরিয়ে বেডরূমে ঢুকল জুবের। লাশটার দিকে তাকালই না। বাথরূমে ঢুকে রক্তাক্ত আঙ্গুলগুলো স্যাভলন দিয়ে ধুলো। তারপর জামবাক লাগিয়ে ফিরে এল বেডরূমে। লাশের দিকে পিছন ফিরে একটা চেয়ারে বসল সে। ভাবছে।

শেষ রাতের দিকে সরাতে হবে লাশটা। কর্মশালা উপলক্ষে হোটেলে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত লোকজন আসা-যাওয়া করে। তার মানে, হাতে বার ঘণ্টা সময় রয়েছে। হঠাৎ সানিয়ার গার্জেন মাহবুবের কথা মনে পড়ে গেল জুবেরের। নিশ্চয়ই বেঁটে, কোঁকড়ানো চুলের লোকটাই সানিয়ার মাহবুব ভাই, গার্জেন। তার সাথে ছ'টার সময় এই হোটেলেরই বারে দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে সানিয়ার। সানিয়াকে দেখতে না পেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবে সে। এই খোঁজাখুঁজিটা বন্ধ করা দরকার। কিভাবে তা সম্ভব?

একটা বুদ্ধি এল মাথায়। টেলিফোনের রিসিভার তুলে অনুসন্ধানকে চাইল সে। যোগাযোগ পেতে বলল, 'মিঃ মাহবুবের জন্যে ইফফাৎ সানিয়ার একটা মেসেজ আছে। তিনি ছ'টার সময় বারে আসবেন। লিখে নিন, প্লীজ। মেসেজটা হল—'একঘেয়ে লাগছে, তাই রামুতে বেড়াতে যাচ্ছি। সকালে আপনার সাথে দেখা করব। ইফফাৎ সানিয়া।'

মেসেজটা লিখে নিয়ে অনুসন্ধানের লোকটা জানাল, মাহবুব সাহেব এলে খবরটা তাকে জানানো হবে।

রিসিভার রেখে দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল জুবের। মুখ তুলে কামরার চারদিকে তাকাল। এক কোণে মস্ত একটা কাঠের আলমিরা দেখে ভাবল, লাশটা ওটার ভেতর লুকিয়ে রাখা

যেতে পারে।

কিন্তু লাশটা তুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল জুবের। আগের চেয়েও যেন বেড়ে গেছে ওজন। কোন রকমে আলমিরার ভেতর ঢোকাল সেটাকে, তালা লাগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। হাঁপাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পর স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল জুবের। হাতে সাঁতা-রের পোশাক। দরজায় তালা দিয়ে করিডোর ধরে এগিয়ে গেল। গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছে। সাগরে নেমে মনের খুশিতে সাঁতার কাটবে সে এখন।

সাতাশ নম্বর স্যুইট থেকে প্রথমে জেসমিনকে, তারপর জুবেরকে বেরুতে দেখে মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেল শফিক। এ আবার কি রহস্য। মেয়েটা এখন চাইলেও স্যুইট থেকে বেরুতে পারবে না, দরজায় তালা দিয়ে গেছে জুবের। এর মানে? হাতের তালু ঘামতে শুরু করল শফিকের। বুঝতে পারছে, কোথাও সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কি অনুমানও করতে পারছে না সে। লাফ দিয়ে থিলানের মাথা থেকে নেমে পড়ল, চারদিক দেখে নিয়ে সাতাশ নম্বর স্যুইটের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কান পাতল দরজায়। কোন শব্দ নেই। সাহস করে আঙুলের গিট দিয়ে টুক টুক আওয়াজ করল দরজার গায়ে। তবু কেউ সাড়া দিল না ভেতর থেকে। এবার জোরে ধাক্কা দিল কবাটে। সাড়া নেই। সব-জান্তার মতো আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। ছোকরা জুবের সাড়া দিতে নিষেধ করে গেছে মেয়েটাকে, ঠিক তাই। হঠাৎ সন্দেহ হল,

কে যেন লক্ষ্য করছে তাকে। ঘাড় ফেরাতেই হোটেলের গোয়েন্দাকে দেখতে পেল সে। ঠিক গোয়েন্দা নয়, গার্ডদের হেড। নামী-দামী অতিথি উঠেছেন হোটেলে, চুরি-চামারির ভয় আছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যেই নতুন একজন লোককে বহাল করা হয়েছে। পদটার গালভরা নাম, হোটেল ডিটেকটিভ। লোকটাকে সন্দেহমুক্ত করার জন্যে নিজেই তার দিকে এগিয়ে গেল শফিক। জানতে চাইল, 'টি আলম সাহেব স্যুইটে আছেন কিনা জানেন?'

'নেই,' সংক্ষেপে উত্তর দিল গোয়েন্দা। 'আপনি সাংবাদিক?'

'হ্যাঁ,' বলল শফিক। খানিক চিন্তা করল সে, তারপর বলল, 'বিখ্যাত লোকদের দেখা পাওয়াই মুশকিল। ঠিক আছে, পরে আরেক-বার আসব আমি।' গোয়েন্দাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল সে। মনে মনে ভাবছে, আপদটা কতক্ষণ ওপরে থাকবে কে জানে। তবে আশার কথা হল, জুবের আলম না ফেরা পর্যন্ত তো আর স্যুইট থেকে বেরুতে পারছে না মেয়েটা।

নিচের হলঘরে নেমে এল শফিক। ইঙ্গিতে দারোয়ানকে ডেকে তার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। 'আলম সাহেবদের কেউ ফিরলেই খবর দেবে আমাকে, কেমন?' দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হল দারোয়ান।

টেলিফোন বুথের ভেতর ঢুকল শফিক। রিসিভার তুলে টি আলমের স্যুইটের সাথে যোগাযোগ চাইল সে। রিঙ হল, কিন্তু রিসিভার তুলল না কেউ। বুথ থেকে বেরিয়ে এল শফিক। বারে ঢুকে দেখল, দেয়াল ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। বারে লোকজন নেই বললেই চলে। একটা টেবিলে বসে রুটি, গরুর মাংস আর দু'পেগ হুইস্কি চাইল সে। মনের যা অবস্থা বিদেশী মদ-

ছাড়া মাথাটা পরিষ্কার হবে না। এই অসময়ে খেয়ে নিচ্ছে, তার কারণ আর হয়ত খাবার সময় পাবে না সে। ঠিক করেছে, এর শেষ দেখে ছাড়বে, দরকার হলে সারারাত সাতাশ নম্বর স্যুইটের দরজার ওপর নজর রাখবে সে। মেয়েটাকে বেরুতে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার।

তিন

ভারতীয় তথ্য চিত্র দেখে হল থেকে বের হলেন টি আলম, সাথে ম্যানেজার নুরুল হক। সামনে একজন লোককে দেখে নুরুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'ইফফাৎ সানিয়ার এজেন্ট না লোক-টা? কি যেন নাম…মাহবুব হোসেন?'

'জী, স্যার,' মাহবুবকে দেখে নুরুল হক ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ওকে যখন পেয়ে গেছি, কথাটা তুলে দেখা যাক…'

'ডাকো ওকে।'

নিজের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন টি আলম। একটু পরই মাহ-বুব হোসেনকে ধরে নিয়ে এল নুরুল হক। টি আলম ডাকছেন শুনেই আনন্দে-আশায় ঘামতে শুরু করেছে মাহবুব হোসেন। একবার তাকিয়েই তার মনের অবস্থা টের পেলেন টি আলম। উষ্ণ আন্তরিক-তার সাথে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'এই যে, মাহবুব সাহেব, এমন গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে কাজ চলবে? ভেবেছেন কেউ জানে না, আপনার কাছে একটা সোনার খনি আছে? ইফফাৎ

সানিয়ার কথা বলছি, সাহেব। মুকুল হককে অনেক আগেই বলেছি, মেয়েটা একটা প্রতিভা। তা, ও কি এখন খুব ব্যস্ত নাকি?'

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টি আলমের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল মাহবুব, হাতটা যেন ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি, ভয় হচ্ছে পচ্ করে ভেঙে যাবে। 'না, স্যার। সানিয়ার হাতে এখন কোন কাজই নেই। আপনি ওকে কাজ দেবেন সে তো ওর সৌভাগ্য...'

'তাহলে সবাই মিলে আজ ডিনারে বসি না কেন?' রিস্টওয়াচ দেখে বললেন টি আলম। 'ন'টা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকব। তাহলে সাড়ে ন'টায়, রেনবোর বারে, কেমন? সানিয়াকে সাথে করে আনবেন তো?'

'অবশ্যই, স্যার, অবশ্যই...'

হাত তুলে একটু নাড়লেন টি আলম, তারপর গাড়িতে উঠে পড়লেন। ড্রাইভারের পাশে বসল মুকুল হক। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। কিন্তু নিজের জায়গায় হতভম্ব মাহবুব হোসেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র কি যে ঘটে গেল তা যেন এখনও সে ভাল করে বুঝতে পারছে না। তবে কি এত দিনে ভাগ্যের চাকা ঘুরল সানিয়ার? অনেক কষ্ট করেছে মেয়েটা, আর তার ভরণপোষণের জন্যে, একটা ভাল সেন্ট কিনে দেয়ার জন্যে দিন মজুরের কাজ ছাড়া আর সবই করতে হয়েছে এই মাহবুবকে...তবে কি দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে তাদের? হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল সে। বোকার মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? নিজেকে তিরস্কার করল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। ছ'টা বাজে। তার অপেক্ষায় রেনবোর বারে বসে আছে সানিয়া।

প্রায় ছুটতে শুরু করল মাহবু।

তিন মিনিট পর রেনবোর বারে দেখা গেল তাকে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের সামনে। হাতে একটা চিরকুট। তাতে লেখা —'একঘেয়ে লাগছে, তাই রামুতে বেড়াতে যাচ্ছি। সকালে আপনার সাথে দেখা করব। ইফফাৎ সানিয়া।' এক দুই করে ছয় বার মেসেজটা পড়ল মাহবুব। স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, অথচ এর মাথা মুণ্ডু কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে। বলা নেই কওয়া নেই, রামুতে কেন গেল সানিয়া? কার সাথে গেল? আর সময় পেল না, ঠিক আজকেই তার রামুতে যাবার ইচ্ছে হল? রিস্টওয়াচ দেখল আবার। ছ'টা দশ। তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় আছে হাতে, হয়ত রামুতে গিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে…হাতের চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

মাহবুব বেরিয়ে যেতেই নিজের টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল শফিক। মাহবুবকে চেনে সে, এতক্ষণ ধরে তাকেই লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে গিয়ে দলা পাকানো কাগজটা তুলে নিয়ে ফিরে এল আবার টেবিলে। কাগজটার ভাঁজ খুলে মেসেজটা পড়ল সে। ভুরু কুঁচকে উঠল। আবার ঘামতে শুরু করল তার হাতের তালু। আরে, রহস্য দেখছি জট পাকাচ্ছে! টি আলমের স্যুইট থেকে বেরুল কখন সানিয়া? উঁহুঁ, এর মধ্যে মস্ত কোন ঘাপলা না থেকেই পারে না। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে দারোয়ানকে ধরল। 'ওহে, ইফফাৎ সানিয়াকে বাইরে বেরুতে দেখেছ?'

'না, স্যার। তিনি এখনও হোটেলেই আছেন।'

'টি আলমরা কেউ এখনও ফেরেননি, না?'

'না, স্যার।'

আরো দু'একজনকে জিজ্ঞেস করল শফিক, কিন্তু সানিয়াকে কেউ

বেরিয়ে যেতে দেখেনি। তাহলে ? মাথাটা গরম হয়ে উঠল শফিকের। তাহলে এই রকম একটা ভুয়া মেসেজ দেবার মানে কি ? মেয়েটা কি তবে জুবেরের সাথে রাত কাটাবার মতলব এঁটেছে ? কিন্তু শুধু এই জন্যে কি কেউ তালা দেয়া ঘরে একা এতক্ষণ ধরে বসে থাকে ? উহুঁ, ঠিক বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না। কি করবে ভাবছে সে, এই সময় হোটেলের লবিতে টি আলমকে ঢুকতে দেখল। সাথে নুরুল হক। শুনতে পেল, টি আলম নুরুল হককে বলছেন, 'সাড়ে ন'টায় বারে থেকো তুমি, হক। সানিয়ার সাথে দরে বনলে আগামী ছবির জন্যে ওকেই নেব।'

দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল শফিক। এক এক লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে তিন তালায় উঠে এল। ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে খিলানের ওপর উঠছে, এই সময় লিফটের দরজা খুলে তিন তালায় করিডোরে বেরিয়ে এলেন টি আলম। সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ভেতর থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

স্যুইটে ঢুকে লাউঞ্জের টেলিফোনের দিকে এগোলেন টি আলম। কয়েকটা ফোন করা দরকার। রিসিভার তুলে ডায়াল করছেন, এই সময় স্যুইটে ঢুকল জেসমিন। স্বামীকে ফোনে কথা বলতে দেখে তাকে আর বিরক্ত না করে নিজের বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সে। পোশাক বদল শেষ করেছে, এই সময় হাতে হুইস্কি ভর্তি গ্লাস নিয়ে বেডরুমে ঢুকলেন টি আলম।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ছিল জেসমিন, স্বামীকে ঢুকতে দেখে ঘুরে বসল সে। 'এসে ভালই করেছ,' বলল সে। 'বসো। তোমার সাথে জরুরী একটা কথা আছে।'

ড্রেসিং টেবিলের ওপর হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বিছানার

ওপর বসলেন টি আলম। 'কি ব্যাপার, জেসমিন? তোমাকে যেন কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে?'

'না···মানে,' কথাটা কিভাবে শুরু করবে, আদৌ তোলা উচিত হবে কিনা ইত্যাদি চিন্তা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে জেসমিনকে। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যগুলো—লাল পর্দার রশিটা ঝুলছে জুবেরের হাতে, তার মুখে অর্থহীন হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, ধীর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে সে···। দ্বিধা কাটিয়ে উঠল জেসমিন। 'না, মানে, জুবেরের কথা বলছিলাম···'

'জুবের? সে আবার কি করল?' ছেলের নাম শুনেই বিরক্তি বোধ করলেন টি আলম।

'আলম, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার,' নিচু গলায় বলল জেসমিন। 'কথা দাও, এ ব্যাপারে জুবেরকে তুমি কিছু বলবে না?'

এই প্রথম অবাক হলেন টি আলম। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তাঁর। 'কোন অঘটন ঘটেছে, জেসমিন?'

'তুমি আগে কথা দাও···'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর টি আলম বললেন 'বেশ। দিলাম।'

'জুবের একটা মেয়েকে···এখানে নিয়ে এসেছিল।'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন টি আলম। 'কি! কি বললে? মেয়ে? জুবের? এই স্যুইটে?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর একটা হাত ধরল জেসমিন। 'শান্ত হও। যা হবার হয়ে গেছে। কথাটা নিজেই স্বীকার করেছে জুবের, বলেছে আর কখনও এ-ধরনের ঘটনা ঘটবে না। তোমার জানা উচিত, তাই তোমাকে বলা। এখন যদি···'

'কোথায় সে ?' চোখ গরম করে জানতে চাইলেন টি আলম। 'ওকে আজ আমি লাথি মেরে বিদায় করব...'

'ছি, আলম। এসব কি বলছ। ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে...'

'মেয়েটা কে ?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন টি আলম।

'জানি না। সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখি...'

'ওকে যদি শাসন করতে না দাও, আমাকে তাহলে এসব শোনাবার দরকারটা কি ?' বললেন টি আলম। 'মেয়েদের পিছনে ইডিয়টের মতো ঘুর ঘুর করুক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু তাই বলে নোংরা একটা বাজারের মেয়েকে ঘরে আনবে, আর আমি তা সহ্য করব, এ কেমন কথা ?' রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। 'কোথায় সে ?'

'সাঁতার কাটার জন্যে ওদেরকে রেখে চলে গিয়েছিলাম আমি। আমাকে বলল, মেয়েটাকে বিদায় করে দেবে। ফিরলাম তো তোমার পরে...বোধহয় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। বলছিল, ও নাকি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে তুমি ওকে কিছু বলতে পারবে না। আমি ওকে কথা দিয়েছি...'

মাথার চুলে আঙুল চালাতে শুরু করলেন টি আলম। ছেলের কথা এরই মধ্যে মাথা থেকে বের করে দিয়েছেন তিনি। তিন চার মিনিটের বেশি একটানা তার কথা ভাবতে পারেন না কখনও। নতুন একটা কাহিনী লেখাচ্ছেন এক লেখককে দিয়ে। গল্পের ছকটা তিনিই যোগান দিয়েছেন, লেখক সেটার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছে। সেগুলো কিভাবে দূর করা যায় ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে। নিরিবিলিতে একটু বসতে চান তিনি। তারপর, জার্মানীর

পরিচালক ওয়ালথার ফিচারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাড়ে আটটায়। সাড়ে ন'টায় ডিনার, সানিয়ার সাথে একটা মৌখিক চুক্তিতে পৌঁছুতে হবে। সাড়ে দশটায় আরেকটা ছবি দেখতে যাবেন।

'আচ্ছা, জুবেরকে তোমার একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না?' হঠাৎ জানতে চাইল জেসমিন।

'কি?' সম্বিত ফিরে পেয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন টি আলম। 'অস্বাভাবিক? তার মানে?'

'না, মানে…ওকে আমার ঠিক সুস্থ বলে মনে হয় না। লক্ষ্য করেছ, সব সময় সানগ্লাস পরে থেকে ও? ঘরের ভেতর, কিংবা রাতের বেলা ওটা পরে থাকার দরকারটা কি?'

'তাতেই তোমার মনে হল ও অস্বাভাবিক?'

'তুমি তো কিছুই লক্ষ্য কর না। আরো অনেক ব্যাপার আছে। কিছু জিজ্ঞেস না করলে কথা বলে কারো সাথে? একা একা বসে কি অত ভাবে বলতে পার? তুমি বুঝতে পার না, কিন্তু আমার মনে হয়, জুবের ঠিক সুস্থ নয়।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'ওর মা-ও তো…তুমিই বলেছিলে, ঠিক সুস্থ ছিলেন না।'

চেহারাটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল টি আলমের।

ফৌজিয়া, জুবেরের মা, সুস্থ ছিল না বললে কম বলা হয়। আত্মহত্যা না করলে পাগলাগারদে ভরে রাখতে হত তাকে। বারো বছর আগের ঘটনা, কিন্তু মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে টি আলমের। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিল ফৌজিয়া। প্রাণ চঞ্চল, একটু বেশি অস্থির, একটু বেশি খেয়ালী, আবার হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠত—এসবই খুব স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিলেন টি আলম। কিন্তু তিনি যদি আরেকটু মনোযোগ দিতেন, বুঝতে পারতেন,

ফৌজিয়ার মধ্যে পাগলাটে একটা ভাব আছে। শুধু তাই নয়, সেই সাথে টের পেতেন, পাগলামির ভাবটা দিনে দিনে বেড়ে উঠছে।

বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালাত ফৌজিয়া। সাধারণতঃ খুব কম হাসত, কিন্তু যখন হাসত, কার সাধ্যি থামায় তাকে। টি আলমের বন্ধু-বান্ধবরা অবশ্য বুঝতে পেরেছিল, ভদ্রমহিলা সুস্থ নন। কিন্তু টি আলম নিজে কিছুই টের পাননি। আসলে এই একটি বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল না।

প্রথম এবং শেষ সন্তান জুবের ভূমিষ্ঠ হল। ছেলেকে ফৌজিয়া আয়ার হাতে তুলে দিল। তারপর ছেলের প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ পেতে শুরু করল। সবই দুর্ভাগ্য ধরে নিয়ে ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন টি আলম।

তারপর সেই ভয়ংকর রাতটা এল। স্টাডিরুমে বসে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন টি আলম। হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়তে দেখলেন, হাতে একটা ছুরি নিয়ে গুটি গুটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে ফৌজিয়া। পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে, তখনও বুঝতে পারেননি। তারপর, পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফৌজিয়া। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে দ্রুত সরে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাতের উল্টো দিকে, কনুইয়ের ওপর গেঁথে গিয়েছিল ছুরিটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে ধরতে যাবেন, তার আর সময় পাননি, তার আগেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ফৌজিয়া। সোজা একটা হোটেলে গিয়ে ওঠে সে। ছয়তালার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন টি আলম। 'হ্যাঁ, তা ছিল,'

জেসমিনের চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে জুবেরও তার মতো মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'এসব ভুলে যাওয়াই ভাল, জেসমিন। জুবের...' হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে থেমে গেলেন। 'বোধহয় আমার ফোন। শোনো, এসব আজেবাজে কথা ভেবে মন খারাপ কর না। তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তা নয়। এতদিন ধরে দেখছি ওকে, কই, আমার তো ওকে কখনও অসুস্থ বলে মনে হয়নি।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, দরজার দিকে পা বাড়ালেন। 'আসছি।'

স্বামীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল জেসমিন, তারপর কি মনে করে তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল লাউঞ্জে। টি আলম ফোনে কথা বলছেন, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে জুবেরের বেডরুমে ঢুকে পড়ল জেসমিন। কেন যেন, প্রথমেই তার নজর পড়ল কাঠের আলমিরাটার দিকে। হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠল তার। কিন্তু সেই সাথে প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ অনুভব করল সে. ধীরে ধীরে এগোল আলমিরাটার দিকে। বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে। হাতল ধরে টান দিল সে। খুলল না কবাট। তালা দেয়া. কিন্তু কী হোলে চাবি নেই। পরমুহূর্তে, কোন কারণ ছাড়াই, কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার প্রচণ্ড একটা তাগাদা অনুভব করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক রকম ছুটেই কামরা থেকে বরিয়ে এল। বেরিয়েই একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল জুবেরের। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। কেমন যেন ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জুবের।

আতংকে জেসমিনের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে দেখে আবার সেই অর্থহীন হাসি দেখা গেল জুবেরের ঠোঁটে এখনও ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে টি আলমকে। জুবেরকে কোন

রকমে পাশ কাটিয়ে এল জেসমিন, নিজের ঘরের দিকে যাবার সময় পিছনে জুবেরের দৃষ্টি অনুভব করল সে। শিরদাড়ায় কাছে ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে ভাব।

রাত দশটা। রেনসোর বার। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুবের। কাছের একটা টেবিল দখল করে বসে আছেন টি আলম, নুরুল হক এবং মাহবুব হোসেন। কথা বলছেন ওঁরা, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে জুবের।

রাগে চেহারাটা লাল হয়ে উঠেছে টি আলমের। 'সানিয়াকে পাননি, এটা একটা অজুহাত হল?' মাহবুবকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তিনি। 'বেশ। কিন্তু কথাটা আমাকে জানালে কি হত? ওকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছি, সেজন্যেই কি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন আপনি?'

অধোবদনে বসে আছে মাহবুব। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আবার আমি ক্ষমা চাইছি, মিঃ আলম। রামুর কোথাও খুঁজে পাইনি ওকে। তবে কথা দিচ্ছি, কাল ওকে আমি আপনার কাছে ধরে আনবই···'

'দায়িত্বটা তোমার ওপর থাকল, হক,' ম্যানেজারকে বললেন টি আলম। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে এলেন ছেলের দিকে। 'জুবের, আমার সাথে যাচ্ছ তুমি। এই ছবিটা তোমার দেখা দরকার।'

চমকে উঠল জুবের। আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু মানে, আমার যে আরেক জায়গায় যাবার কথা···'

'অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরে থাকার এই অভ্যেসটা ছাড় বুঝলে?' চটে উঠে বললেন টি আলম। 'আর, সব সময় ওই চশমাটা পরে থাক কেন? খোল।'

নিঃশব্দে চশমাটা খুলে পকেটে রাখল জুবের। 'বলছিলাম কি...'

'যাই বল, তোমার কথা শুনছে কে?' চাপা গলায় গর্জে উঠলেন টি আলম 'তুমি আমার সাথে ছবি দেখতে যাচ্ছ।'

জেসমিন কি সব কথা বলে দিয়েছে বাবাকে? ভয় দেখাবার পরও? মনে হয় না। তাহলে বাবা এত চোটপাট দেখাচ্ছেন কেন? বাবা ওর কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখনও, তাড়াতাড়ি বলল সে, 'ঠিক আছে, বাবা। তাই যাব। ওপর থেকে কাপড়টা পাল্টে আসি তাহলে?'

রিস্টওয়াচ দেখলেন টি আলম। 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। গেটে বলে রাখব, ওরা তোমাকে আমার পাশের সীটটা দেখিয়ে দেবে।' বাবা চলে গেলেন, সাথে সাথে পকেট থেকে চশমা-টা বের করে আবার পরল জুবের।

তিন তালায় ওঠার জন্যে লিফটে চড়ল সে। ভাবছে। হাতে এখনও সময় আছে ছ'ঘণ্টা। এই ছ'ঘণ্টার আগে লাশটাকে সরানো সম্ভব নয়। যাক, ভালই হল, ছবি দেখতে গিয়ে তবু সময়টা কাটিয়ে দেয়া যাবে।

হঠাৎ লিফট অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সারারাত ডিউটি দাও? নাকি অটোমেটিক সিস্টেম চালু করা হয়?'

'রাত তিনটের সময় অটোমেটিক সিস্টেম চালু হয়ে যায়, স্যার।'

তথ্যটা জানা ছিল জুবেরের, তবু আরেকবার জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিল। লিফট ব্যবহার না করে লাশটাকে সরানো যাবে

না। আলমিরা থেকে লাশটা বের করতে হবে রাত তিনটের পর। লাউঞ্জ পেরিয়ে করিডোরে আনতে হবে, সেখান থেকে লিফটে। এসব ভাবতে গিয়ে হার্টবিট বেড়ে গেল তার। লাশ নিয়ে লাউঞ্জ পেরোবার সময় মস্ত একটা ঝুঁকি নিতে হবে তাকে। জেসমিন বা বাবা হয়ত ঠিক ওই সময় কোন দরকারে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তারপর করিডোর। সেখানেও কেউ দেখে ফেলার ভয় আছে। হঠাৎ আপন মনে হাসল সে। ভয় আছে বলেই তো কাণ্ডটা করেছে। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে স্যুইটে ঢুকে পড়ল জুবের। জেসমিনের কামরায় আলো জ্বলছে। বোধহয় সে-ও সিনেমা দেখতে যাবে। পা টিপে টিপে নিজের কামরায় ঢুকল ও। আলমিরার সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে ধীরে ধীরে বের করল চাবিটা। তালা খুলল। খোলার সময় লক্ষ্য করল, তার হাতটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। 'এই ব্যাটা, ভয় পাস নাকি?' বিড় বিড় করে জিজ্ঞেস করল নিজেকেই।

ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই আছে লাশটা। হাত বাড়িয়ে লাশটার একটা হাত ছুঁলো সে। ঠাণ্ডা। ঝট করে সরিয়ে নিল হাত। যেন ছ্যাঁকা লেগেছে। কোথায় যেন শুনেছে, মরার পর সময়ের সাথে সাথে ওজন বেড়ে যায় লাশের। কোট বের করে বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। কবাট দুটো বন্ধ করতে যাবে, এই সময় খুট করে শব্দ হল পিছনে। দ্রুত কবাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে পিছন ফিরল সে। এক সেকেণ্ড পর দরজায় দেখা গেল জেসমিনকে।

লাল একটা শাড়ি পরেছে জেসমিন। আগুনের মত জ্বলছে যেন মেয়েটা। জুবেরকে আলমিরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। বুক থেকে খসে পড়ল শাড়ি। ভি

কাট ব্লাউজের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে যমজ পাহাড়। 'কখন ফিরলে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জেসমিন।

'এই তো,' বলল জুবের। আলমিরার কাছ থেকে সরে এল সে। একটা সিগারেট ধরাল। 'বাবার হুকুম, তার সাথে সিনেমা দেখতে হবে' কাঁধ ঝাঁকাল সে। একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে তাকিয়ে থাকল জেসমিনের দিকে। 'তুমিও যাচ্ছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল জেসমিন। তারপর গলার স্বরটা আরো খাদে নামিয়ে জানতে চাইল, 'জুবের, কোন অঘটন ঘটেনি তো?'

'কি? অঘটন? না। হঠাৎ এ কথার মানে?'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, মানে...' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না জেসমিন। 'সেই মেয়েটা...তাকে কি তুমি...?'

'বিদায় করে দিয়েছি। চিরতরে। আর কোন দিন আমাকে বিরক্ত করবে না সে।'

হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল আলমিরার দরজাটা। বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড় ফেরাল জুবের। দেখল, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে আলমিরার দরজা। তারপর হঠাৎ আধখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সানিয়ার লাশটা। ধপাশ করে মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

চার

কেউ জানে না, জেসমিনের এই কোমল রূপ-সৌন্দর্যের ভেতর ইস্পাত-কঠিন একটা মানুষ বাস করে। সমাজের নিম্নস্তরে জন্ম তার, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও অম্লান হয়ে

আছে তার মনে। ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে বস্তিতে, লোককে মদ খেয়ে মাতাল হতে দেখা থেকে শুরু করে খুন হতে দেখা পর্যন্ত সবই তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা আছে। কিশোরী বয়সে বাবার বেদম লাথি-গুঁতো খেয়ে পয়সা রোজগারের জন্যে রাস্তায় বেরুতে হত তাকে। জীবন যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তা তার অজানা থাকার কথা নয়। সেজন্যেই দারিদ্র্য আর নিরাপত্তার অভাবকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে জেসমিন।

সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে তার। মেয়েমানুষের দালালরাই ওর রোজগারের বেশিরভাগ টাকা হজম করে ফেলত। কিন্তু সুদিনের আশায় মুখ বুঁজে তাদের এই শোষণ সহ্য করত সে। ভাগ্যই বলতে হবে, সুদিন আসতে দেরি হলো না। হঠাৎ করেই একদিন এক চিত্র পরিচালকের চোখে পড়ে গেল জেসমিন। দালালদের খপ্পর থেকে তাকে উদ্ধার করে ছায়াছবির জগতে নিয়ে এল তাকে সেই পরিচালক। প্রথমে ছোট কয়েকটা কাজ পেল জেসমিন, এবং তার ওই কাজগুলো যারা দেখল তারা সাথে সাথে বুঝল, জেসমিন একটি প্রতিভা। বলতে গেলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠল সে। এরপর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়। ছবিগুলো মুক্তি পাবার পর দেখা গেল বাংলাদেশের সিনেমা দর্শকরা লুফে নিয়েছে তাকে। ঠিক এই সময়ই তার পরিচয় হয় টি আলমের সাথে। পরিচয় থেকে প্রণয়, তারপর পরিণয়।

জীবনে যতটা যা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে জেসমিন। পারিবারিক মর্যাদা, কোটিপতি স্বামী, যশ—নিজেকে বড় সুখী বলে মনে হয় তার। কোন কিছুর বিনিময়েই এই সুখ সে হারাতে চায় না।

লাউঞ্জে একটা সোফায় বসে আছে জেসমিন। শক্ত মুঠো করা হাত দুটো কোলের ওপর, হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। তাকিয়ে আছে জুবেরের দিকে, চোখে আশ্চর্য কঠিন দৃষ্টি। ডান চোখের পাশে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল একটা শিরা। অনেকক্ষণ পর আলমিরা থেকে বেরিয়ে আসা লাশটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আবার সেই কঠিন চোখে তাকাল জুবেরের দিকে। 'ইফফাৎ সানিয়া, তাই না?' গলার স্বরটা একটুও কাঁপল না দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে।

আতংকের ধাক্কাটা জুবেরও কাটিয়ে উঠেছে। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ।' জেসমিনের আচরণ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেছে সে। ব্যাপার-টাকে এমন স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে কিভাবে ও।

'ওকে তুমি খুন করেছ। কেন?' যেন কাঁচের গ্লাস ভেঙে ফেলেছে ছোট্ট জুবের, জেসমিন তাকে শাসন করছে।

দারুণ কৌতুক বোধ করল জুবের। সেই অর্থহীন হাসিটা আবার দেখা গেল তার মুখে। 'খুন নয়। দুর্ঘটনা।'

'সব খুলে বল আমাকে,' আদেশের সুরে বলল জেসমিন।

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জুবের। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, ওর মুখে তুলো গুঁজে দিয়ে, হাত-পা বেঁধে বাথরুমে ফেলে রেখেছিলাম। শুধু একটা কথা বলিনি। তার আগে ওর সাথে আমার ধস্তাধস্তি হয়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও। কিন্তু মারা গেছে তা আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি আমি একটা মরা মেয়ের হাত-পা বাঁধছি। তুমি সাঁতার কাটতে চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম।'

'চমৎকার! বেশ গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পার তো!' ভেঙচে

উঠল জেসমিন। 'সত্যি কথা বল, তুমি ওকে জেনেশুনে খুন করনি ? ওর গলায় কিসের দাগ ওটা ? তোমার হাতে পর্দার রশি ছিল কেন ?' ধমক দিয়ে কথা বলা উচিৎ হচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছে জেসমিন। ছেলেটা যে আসলেই পাগল তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। 'কেন, জুবের ? কেন ?'

চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল জুবেরের। 'হ্যাঁ, স্বীকার করছি। খুন করেছি ওকে। কেন ?' উদাস চোখে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, জানি না।'

'জান না।' হিস হিস করে উঠল জেসমিনের গলার চাপা আওয়াজ।

'আমাকে কেউ দেখতে পারে না, হয়ত সেজন্যেই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। নিজের কাছে, কারো কাছে আমার কোন মূল্য নেই, হয়ত তাই। জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাই না, সেটাও হয়ত একটা কারণ। ঠিক জানি না, জেসমিন।'

একটা ঢোক গিলল জেসমিন।

'শুধু জেনে রাখ, উত্তেজিত হতে চেয়েছিলাম আমি,' আবার বলল জুবের। 'মনে হয়েছিল, মস্ত একটা ঝুঁকি নিলে হয়ত একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারব।' কৃত্রিম হাসিটা আবার ফুটে উঠল মুখে। 'তুমি যে এত চালাক তা কিন্তু বুঝিনি আমি। ঠিক ধরে ফেলেছ।' হাসি মিলিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। 'এখন কি করতে চাও তুমি ? বাবাকে বলে দেবে ?'

'তাকে বললে তিনি কি করবেন, জান ?'

'জানি। বাবা আমাকে সহ্য করতে পারেন না। পুলিশ ডাকবেন।'

রিস্টওয়াচ দেখল জেসমিন। দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ছবি শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। ওদেরকে পৌছুতে না দেখে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে পারে জুবেরের বাবা। 'আমাকে ভাবতে দাও··· তুমি একা নও, এর সাথে তোমার বাবা এবং আমিও জড়িয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে আলম পরিবারের মান-সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না।' এবং পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হোক, তা আমি চাই না, মনে মনে বলল জেসমিন। কি করা যেতে পারে? পুলিশ ডাকবে? আলমকে সব বলে দেবে? উঁহুঁ, এসব করা মানে তার সামাজিক অস্তিত্বটাকে গলা টিপে হত্যা করা। তিরিশ লাখ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে ছবিটা, ছেলে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হলে সেটা কি আর দেখানো যাবে? খবরটা ছড়িয়ে পড়লে বিদেশ ভ্রমণের নিমন্ত্রণগুলো কি আর রাখতে পারবে টি আলম? প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রীর ডিনার পার্টিতে কি আর ডাকা হবে তাদেরকে?

হঠাৎ টের পেল জেসমিন, তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জুবের। ওর মনে কোন সন্দেহ রাখলে চলবে না। ও যদি ভেবে বসে আমি পুলিশ ডাকার কথা ভাবছি, তাহলেই বিপদ। মৃদু একটু কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় তার ব্যবস্থা সবচেয়ে আগে করা দরকার,' নরম সুরে বলল সে। 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু লাশটাকে নিয়ে কি করবে, ভেবেছ কিছু?'

'একটা বাক্সে ভরে কোথাও ফেলে আসলেই হবে,' হাল্কা সুরে বলল জুবের। 'এখনও ঠিক করিনি কি করব।'

'ভেবে দেখেছ, বাক্সের পরিচয় বেরিয়ে গেলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে? তাছাড়া, অমন একটা ভারি বাক্স তুমি বয়ে নিয়ে যাবে কিভাবে?'

'তুমিই বরং বলে দাও কি করা উচিত,' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল জুবেরের চোখে।

'ওকে ওপরে আনার সময় দেখেনি কেউ ?'

'না।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কি করে ? তোমার সাথে রওনা হবার আগে মেয়েটাই হয়ত কাউকে বলে এসেছে, কোথায় আসছে সে।'

'আমি জানি কাউকে কিছু বলেনি ও।'

'পুলিশকে বোকা মনে কর না। লাশটা পাওয়া মাত্র তদন্ত শুরু হয়ে যাবে। তুমি হয়ত কোন ক্লু ফেলে এসেছ...'

'মনে হয় না,' বলল জুবের। জেসমিন গোটা ব্যাপারটাকে এত সহজ ভাবে নেয়ায় এখনও অবাক হয়ে আছে সে। 'আর যদি কোন সূত্র ফেলেও আসি, ঝুঁকিটা উপভোগ্যই হবে। মজার কথা কি জান, জেসমিন ? খুনের মোটিভ নিয়েই সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামায় পুলিশ। কিন্তু এই খুনের কোন মোটিভ নেই। শুধু লাশটার একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পারলেই পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাব আমি।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'ছবি শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তুমি তৈরি ? আমি শুধু পোশাকটা বদলাব।' জেসমিন উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছন থেকে জুবের আবার বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম, জেসমিন।'

লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে জেসমিনের মনে হল, সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। কোন রকমে টলতে টলতে নিজের কামরায় ঢুকে খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে ফেলল সে। এমন হাঁপাতে শুরু করল, যেন দু'মাইল দৌড়ে এল এখুনি। সারা শরীর আশ্চর্য দুর্বল আর অসাড় লাগছে তার। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। ধীরে ধীরে খাটের

ওপর বসল। বুঝল, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে, এই অসুস্থতা তারই লক্ষণ। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এই সংকটে অস্থির হলে চলবে না। যাই ঘটুক, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার শরীরটাকে সুস্থ আর মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখা। খচ্ করে বিঁধল অমোঘ প্রশ্নটা—কি করবে সে? নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষা করতে গিয়ে একটা হত্যাকাণ্ডের খবর চেপে যাওয়া কি উচিত হবে? আইনের চেয়ে পারিবারিক মর্যাদা বড় হল? তাছাড়া, ব্যাপারটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, খুনের দায়ে তাকেও বিপদে পড়তে হবে। এতবড় ঝুঁকি নেয়াটা কি বুদ্ধিমতীর কাজ হচ্ছে?

কিন্তু পরমুহূর্তে জুবেরের একটা কথা মনে পড়ে গেল…'এই খুনের কোন মোটিভ নেই। শুধু লাশটার একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পারলেই পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাব আমি।' সত্যিই কি লাশের একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পারবে জুবের? ও একটা পাগল, ওর ওপর কি ভরসা রাখার মানে হয়? অবশ্য পুলিশ যাতে ধরতে না পারে সেজন্যে প্রাণপণ করবে জুবের। পাগল হলে কি হবে, ধরা পড়লে যে নির্ঘাৎ মৃত্যু তা সে ভালই বোঝে।

লাউঞ্জ থেকে জুবেরের গলা ভেসে এল, 'তোমার হল?'

এক মিনিট পর স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। থিলানের মাথা থেকে ওদেরকে দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল শফিকের।

ছবি দেখতে বসে গল্পের খেই দু'জনের কেউই খুঁজে পেল না। ছবি শুরু হয়ে যাবার পর হলে ঢুকেছে ওরা, মনের অবস্থাও এমন নয় যে ছবির দিকে মনোযোগ দেবে। জুবেরের লাভ হল এই যে অন্ধ-

কারে বসে চিন্তা করতে করতে লাশটা কিভাবে সরাবে তার একটা চমৎকার উপায় বের করে ফেলল।

হোটেল রেনবোয় দুশো কামরা আছে। তার মানে, কমপক্ষে চার শো লোক উঠেছে ওখানে। অর্থাৎ ধরা পড়ার সম্ভাবনা চার শো ভাগের এক ভাগ। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না। সানিয়াকে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাবারই কোন দরকার নেই। স্যুইট থেকে বের করে লিফটে তুলতে হবে, তারপর লিফটটা টপ ফ্লোরে তুলে ওখানেই রেখে আসতে হবে। ব্যাস।

এরপর ঠ্যালা সামলাক পুলিশ। লাশটা আবিষ্কার হতে ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে। খুনী এই হোটেলেরই বোর্ডার, নাকি কর্মশালা উপলক্ষে হাজার হাজার লোক যারা এসেছে তাদের মধ্যে কেউ, পুলিশ তা বুঝবে কিভাবে? কিভাবে ধরবে কোন্ ফ্লোরে, দুশো ঘরের কোন্ ঘরে খুন হয়েছে সানিয়া?

ধরা পড়ার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই, ভাবল জুবের। নিজের ওপর সন্তুষ্টবোধ করল সে। এখন সব কিছু নির্ভর করছে জেসমিনের ওপর। সে কি নার্ভাস হয়ে সব বলে দেবে বাবাকে? মনে হয় না। মনের জোর ওর সাংঘাতিক। আলমিরা থেকে লাশটাকে পড়তে দেখে চেঁচিয়েও ওঠেনি, জ্ঞানও হারায়নি। অবাক কাণ্ড। যাই হোক, ওর ওপর বিশ্বাস রাখা চলে। আর যদি মনে হয় যে না, ওকে বিশ্বাস করা যায় না, তাহলে সময় থাকতে একটা ব্যবস্থা করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে…

আড়চোখে জেসমিনের দিকে তাকাল জুবের। এক মনে ছবি দেখছে। চেহারা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বারোটার কিছু আগে শেষ হল ছবি। টি আলমের আরো একটা

প্রোগ্রাম আছে, জেসমিনকে নিয়ে প্রথমে সেখানে যাবেন তিনি। তার-পর হোটেলে ফিরবেন। ছবিটা কেমন লাগল, কোন ত্রুটি চোখে পড়েছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেল জুবের। হাঁটতে হাঁটতে সৈকতে চলে এল ও।

নরম বালির ওপর দিয়ে কতক্ষণ ধরে হাঁটছে বলতে পারবে না জুবের, হঠাৎ সামনে একটা জেটি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে সৈকতের বালি। প্রায় পাঁচ শো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে শহরের ঝলমলে আলোকমালা। সাগরের একটানা আওয়াজ ছাড়া শুনতে পাচ্ছে না কিছু। ধীর পায়ে এগোল সে। কাছ থেকে দেখে বুঝল, এটা একটা পরিত্যক্ত জেটি। কিন্তু শেষ মাথায় ছোট একটা বোট বাঁধা রয়েছে দেখে অবাক হল ও। ঢেউ-য়ের দোলায় দুলছে বোটটা। গায়ে পর্যটনের ছাপ দেখে অনুমান করল সাগরে বেড়াবার জন্যে কেউ বোধ হয় ভাড়া করেছে ওটা।

নির্জন, কোথাও কেউ নেই। জেটির কাছাকাছি বালির ওপর বসে পড়ল জুবের। মাথার ওপর উজ্জ্বল চাঁদের দিকে তাকিয়ে সিগা-রেট ধরাল একটা। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। মিনিট তিনেক পর হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনে প্রায় চমকে উঠল ও। শহরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কিছুই দেখতে পেল না,অথচ শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা মোটর সাইকেলের কাঠামো। ভুরু কুঁচকে উঠল জুবেরের। এত রাতে কে আসে? তাও আবার আলো না জ্বেলে? উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল শরীরটা। পর মুহূর্তে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য

করে স্তম্ভিত হয়ে গেল জুবের। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল ও, মোটর সাইকেলের ওপর বসে আছে কোন পুরুষ নয়, একটা মেয়ে। লম্বা কাল এলো চুল পতাকার মতো পত পত করে উড়ছে পিছন দিকে।

জেটির গোড়ায় এসে থামল মোটর সাইকেল। কেন যেন নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না জুবের। সানিয়াকে খুন করে সে কি দৃষ্টিভ্রমের শিকার হয়ে পড়ল? ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। মোটর সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করাল মেয়েটা, তারপর সামনের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ মুখ তুলে জুবেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে।

চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছে মেয়েটার মুখে। বিস্ময়ের মাত্রা একটু কমে গেল জুবেরের। মেয়েটা বিদেশী। তাল গাছের মতো লম্বা, সাড়ে পাঁচ কি তার চেয়েও বেশি হবে। চমৎকার স্বাস্থ্য। শারীরিক কাঠামোয় পুরুষালি একটা ভাব প্রকট হয়ে আছে, কিন্তু মুখের চেহারা অত্যন্ত কমনীয়।

এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। পরিষ্কার দেখল জুবের, চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। নরম গলায়, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল ও, 'কে তুমি? এত রাতে এদিকে কেন এসেছ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মেয়েটা। আরো এক পা পিছিয়ে গেল। বোবা নাকি? ভাবল জুবের। নাকি ইংরেজী বোঝে না? কর্মশালা উপলক্ষে অনেক দেশের মেয়ে এসেছে, তারা সবাই ইংরেজী বোঝে না। আকার-আকৃতি দেখে সন্দেহ হল, জার্মান হতে পারে। ওই একই প্রশ্ন এবার জার্মান ভাষায় করল জুবের। কিন্তু এবারও মাথা নাড়ল মেয়েটা। তবে, জুবেরের নরম কণ্ঠস্বর আর তাকে স্থির হতে

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে, এবার আর পিছিয়ে গেল না। সব শেষে পরিষ্কার ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রশ্ন করল জুবের।

চাঁদের আলোয় মেয়েটার চোখ দুটোকে হেসে উঠতে দেখল জুবের। ধীরে ধীরে প্রসারিত হল ঠোঁট দুটো। স্পষ্ট ফরাসীতে বলল সে, 'এমন নিখুঁত উচ্চারণে ফরাসী বলতে পার তুমি। কোত্থেকে শিখলে?'

'দু'বছর প্যারিসে ছিলাম আমি,' বলল জুবের। 'কিন্তু তুমি এ রাতে…'

'মাছ ধরার ভারি শখ কিনা,' হেসে উঠে বলল মেয়েটা, 'বোট ভাড়া পাওয়া যায় শুনে আর লোভ সামলাতে পারিনি। বাবা অবশ্য আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হয়নি… আমরা ওয়ার্কশপ উপলক্ষে এসেছি, প্যারিস থেকে। আমার নাম জিনেত লরা। আপনি?'

'রফিক চৌধুরী,' কেন যেন মনে হল জুবেরের, নিজের বা বিখ্যাত বাপের পরিচয়টা না দেয়াই ভাল। 'ছবি সম্পর্কে আগ্রহ আছে, তাই অভিজ্ঞতা নিতে এসেছি।' দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে সরে এল সে। 'মাছ পাও?'

'কাল থেকে শুরু করেছি,' বলল জিনেত। 'একটা ছোট চাঁদা পেয়েছিলাম। আশা করছি, আজ আরো ভাল করব।' জুবেরকে পাশ কাটিয়ে জেটির দিকে এগোল সে। তার পিছু নিল জুবের।

জেটির শেষ মাথায় এসে বোটের রশি খুলল জিনেত। রিস্টওয়াচ দেখল জুবের। জোয়ার আসতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। বোটে উঠে বসল জিনেত। জুবেরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল সে। খানিক

ইতস্ততঃ করল। ভাব দেখে মনে হল কিছু বলতে গিয়েও বলা উচিত হবে না ভেবে চুপ করে থাকল সে। তার মনের কথাটা পরিষ্কার ধরতে পারল জুবের···সদ্য পরিচয়, অচেনা বিদেশী একজন লোক, বোটে উঠে সঙ্গ দেবার প্রস্তাব দেয়া উচিত হবে না—কার মনে কি আছে কে জানে।

'শুভরাত্রি,' ভাঙা ভাঙা বাংলায় উচ্চারণ করল জিনেত, নিজেই হেসে উঠল খিল খিল করে, তারপর স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল বোট। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেল সেটা। খানিক পর ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে গেল।

জেটির কিনারায় বসল জুবের। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে তার। কেন যেন, সুন্দরী বা বিদেশী বলে নয়, সাংঘাতিক ভাল লেগে গেছে মেয়েটাকে। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন, মনে মনে স্বীকার করল সে। এতদিন ভেবে এসেছে, মেয়ে। সে তো ঘৃণার পাত্রী। কিন্তু জিনেতকে দেখে তো একবারও তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হল না।

একটা সিগারেট ধরাল জুবের। পকেট থেকে বের করল নীল পুঁতিগুলো। একটা একটা করে ছুঁড়তে শুরু করল পানিতে।

পাঁচ

দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আবার বোটের আওয়াজ পেল জুবের। সাথে সাথে মনটা অভূতপূর্ব আনন্দে নেচে ওঠায় আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

জেটির সামনে থামল বোট। জুবেরকে দেখে জিনেতও কম

আশ্চর্য হয়নি। দু'জন দু'জনের দিকে ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর একযোগে হেসে ফেলল।

'কিছু পেলে?' জিনেতের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল জুবের।

রশি দিয়ে বোট বেঁধে জুবেরের হাতটা ধরল জিনেত, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল জেটিতে। 'পেয়েছিলাম, ছুটে গেছে।' ভাঁজ করা ফিশিং রডটা হাত বদল করে জুবেরের চোখে চোখ রাখল সে। 'তুমি কি সেই থেকেই আছ?'

সরল স্বীকারোক্তির মতো শোনাল জুবেরের কথাগুলো। 'তোমাকে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছিল, জায়গাটাও একেবারে নির্জন, তাই…'

'তুমি বুঝি নির্জনতা খুব ভালবাস?' সকৌতুকে তাকাল জিনেত। কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে আবার বলল, 'আমিও কিন্তু বারবার তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গ চাওয়া উচিত ছিল আমার…'

'কোথায় যেন উঠেছ তোমরা?' জানতে চাইল জুবের।

'গোল্ডেন ইনে। তুমি?'

'প্লাজায়,' অবলীলায় মিথ্যে কথা বলল জুবের। 'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বললে রাত কাবার হয়ে যাবে যে। দেরি দেখে তোমার বাবা হয়ত চিন্তা করবেন…' জিনেতকে আগে বাড়তে দিয়ে তার পিছু নিল সে।

'বিখ্যাত বাবারা কেমন হয় তা তো তুমি জান না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জিনেত। 'ছেলেমেয়েদের খবর রাখার সময় কোথায় তাঁদের!'

প্রায় চমকে উঠল জুবের।

'তোমারও কি মাছ ধরার শখ আছে?'

'একা একা নয়,' বলল জুবের।

মধুর শব্দে হেসে উঠল জিনেত। 'কাল রাত বারোটার দিকে থাকবে এখানে?'

অবশ্যই, মনে মনে বলল জুবের, তবে যদি সানিয়ার লাশটা লিফটে তোলার সময় ধরা পড়ে না যাই। 'আমার সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগবে?'

মোটর সাইকেলের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। 'লাগবে,' বলল জিনেত। 'পিছনে ওঠো, তোমাকে আমি তোমার হোটেলে পৌঁছে দিই...'

'ধন্যবাদ,' বলল জুবের। 'হাঁটতে আমার ভালই লাগবে। কাল আবার দেখা হবে, কেমন? গুডনাইট।'

হাত বাড়িয়ে দিল জিনেত। করমর্দন করল ওরা। তারপর মোটর সাইকেলে উঠে বসল জিনেত, স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। মোটর সাইকেলের লাল আলোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জুবের। আরো আগে কেন পরিচয় হল না ওর সাথে। তা-হলে হয়ত সানিয়াকে খুন করত না সে... ভাবতে ভাবতে পা বাড়াল শহরের দিকে।

নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল শফিক। হাইহিলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ মেলেই দেখল করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে জেসমিন, তার পিছনেই রয়েছেন টি আলম। স্যাই-

টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে? শেষ বার ঘড়িতে সময় দেখেছে বারোটা পঁয়ত্রিশ। এখন বাজে প্রায় তিনটে, দশ মিনিট বাকি। এর মধ্যে সানিয়া ওদের স্যুইট থেকে বেরিয়ে যায়নি তো? নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করল শফিক। কোন্ আক্কেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

পকেট থেকে প্রায়-খালি মদের বোতলটা বের করতে যাবে, এই সময় ঘড় ঘড় আওয়াজ করে খুলে গেল লিফটের দরজা। করিডোরে বেরিয়ে এল জুবের আলম। কোনো দিকে না তাকিয়ে স্যুইটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। প্রথমে হাতল ঘুরিয়ে দেখে নিল তালা দেয়া আছে কিনা, নেই দেখে কবাটের গায়ে চাপ দিয়ে খুলল সেটা। ভেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করে দিল দরজা।

বেশ! আপন মনে মাথা নেড়ে ভাবল শফিক। পুরো সংসার-টাই ফিরে এসেছে। এবার হয়ত নতুন কিছু একটা ঘটবে। নড়েচড়ে বসল সে। চোখ দুটো আটকে আছে সাতাশ নম্বর স্যুইটের দরজায়।

নিজের ঘরে ঢুকে সিগারেট ধরাল জুবের। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকল জেসমিন।

'বাবা কোথায়?'

'আস্তে কথা বল,' ফিসফিস করে বলল জেসমিন। 'শুয়ে পড়ে-ছেন।' একটা ঢোক গিলল সে। 'কি ঠিক করলে?'

খুন করার পর, হাতে যখন একটা লাশ থাকবে, তখন থেকেই শুরু হবে সত্যিকার রোমাঞ্চ, এই রকম ভেবেছিল জুবের। হাতে লাশটা

থাকায় প্রথম দিকে বেশ রোমাঞ্চ যে অনুভব করেনি তা নয়, কিন্তু জিনেত্তের সাথে পরিচয় হবার পর থেকে সব কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। সানিয়াকে লিফটে নিয়ে যেতে হবে, এই চিন্তা-টাই এখন ওর কাছে ভীষণ ক্লান্তিকর বলে মনে হল।

লাশটা লিফটে রেখে আসাই যে সবচেয়ে নিরাপদ, কথাটা জেস-মিনকে বলল সে। সাথে সাথে একমত হল জেসমিন। প্রখর বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারল ও, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। বলল, 'তবে, খুব সাবধানে কাজটা করতে হবে তোমাকে। কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ...'

জেসমিনকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বিদঘুটে একটা প্রশ্ন করে বসল জুবের। 'আচ্ছা, তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন? খুনের খবর চেপে যাওয়া খুনীকে সহায়তা করার সামিল, সেটা তুমিও জান।'

রাগে চেহারাটা লাল হয়ে উঠল জেসমিনের। 'তুমি একটা খুনী তা জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের পরিবারের মান সম্মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধিও কি তোমার নেই নাকি? তোমার পাপের জন্যে আমরা কেন ফল ভোগ করব? তোমার পাগ-লামির জন্যে আমাদেরকে যাতে ভুগতে না হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমি...'

'কারণ কি শুধু এই একটাই?' সেই অর্থহীন হাসিটা আবার দেখা গেল জুবেরের ঠোঁটে। 'আর কোন কারণ নেই?'

'আর কোন কারণ?' হাত নেড়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল জেসমিন, 'তুমি যদি ভেবে থাক, তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি আমি তাহলে বলব, তুমি শুধু পাগলই নও, একটা বোকার হদ্দ।'

'আমি তা বলছি না,' হঠাৎ গলার আওয়াজ একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল জুবের, ফিস ফিস করে বলল, 'আমার ধারণা, আরো একটা কারণে তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে না দিয়ে বরং সাহায্য করছ। কারণটা আর কিছুই না—ভয়।'

'ভয়!' ভুরু কুঁচকে উঠল জেসমিনের। গলার আওয়াজটা নিজের কানেই বিকৃত শোনাল।

'হ্যাঁ। আমাকে তোমার ভারি ভয়। তার অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে। তুমি ভাল করেই জান, আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে তোমাকেও আমি ছাড়ব না।'

'তার মানে?' কাঁপা গলায় বলল জেসমিন। 'কি বলতে চাও তুমি? আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি?'

'নতুন করে তার কি আর দরকার আছে, জেসমিন?' হাসল জুবের। আমার ভয়ে এমনিতেই তো কাহিল হয়ে আছ তুমি। যাক, আমাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের জন্যে ভালই করেছ তুমি। যা হবার হয়ে গেছে, এখন নিজের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে আমাকে। কেউ যদি সেটা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে, তার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে। তুমি হলেও তাই করতে, ঠিক কিনা? কেউ যদি পুলিশে খবর দেয়, তা আমি জানতে পারব। ধরা পড়ার আগে বেঈমানীর প্রতিশোধ নেবার সময়ও একটু করে নিতে পারব।' জেসমিনের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সেই অর্থহীন হাসিটা হাসল সে। 'শোনো, আমার ধরা না পড়ার সাথে তোমার নিরাপত্তার প্রশ্নটাও জড়িত এখন। লিফটে লাশটা তুলতে যাচ্ছি আমি। তুমি আমাকে সাহায্য করছ।'

'আমি!'

'করিডোরে কেউ আছে কিনা দেখতে হবে তোমাকে।' বলল জুবের। 'তারপর লিফটটা তিন তালায় এনে রাখবে। রাজি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজাটা দেখিয়ে দিল জেসমিনকে। 'যাও, উঁকি দিয়ে করিডোরটা দেখে এস। এদিকে তৈরি হচ্ছি আমি।'

দম দেয়া পুতুলের মতো কামরা থেকে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল জেসমিন। কয়েক পা এগিয়ে ধপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়। থরথর করে কেঁপে উঠল শরীরটা। ইচ্ছে হল চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু জুবেরের ভয়ে গলা থেকে কোন শব্দই বের হলো না।

জুবেরের ঘরের ভেতর থেকে খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসছে। এখুনি লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসবে সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেসমিন। ইচ্ছে হল, স্বামীর শোবার ঘরের দিকে ছুটে যায়, দরজার ওপর কিল-ঘুসি মেরে তার ঘুম ভাঙায়, কিন্তু এক চুল নড়তে পারল না সে। জুবের যে মিথ্যে হুমকি দেয়নি, এটুকু বোঝার ক্ষমতা তার আছে। এই মুহূর্তে সে যদি চেঁচিয়ে লোক জড় করার চেষ্টা করে, কোন রকম দ্বিধা না করে তাকে খুন করবে জুবের।

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল জেসমিনের। এই ভুল কেন সে করল। প্রথমেই ফোন করে পুলিশকে সব জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল। অন্তত: স্বামীকে সব কথা জানানো উচিত ছিল তার। এখন, এই শেষ রাতে, তা আর সম্ভব নয়। জুবের তাকে কোন সুযোগই দেবে না।

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল জেসমিন। মনে মনে অভয় দিচ্ছে নিজেকে, হয়ত শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে না জুবের। পুলিশ হয়ত কেসটার কোন কিনারা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সব হাঙ্গামা মিটে গেলে স্বামীকে সব কথা খুলে বলবে সে। দু'জনে পরামর্শ করে

বিদেশী কোন মেণ্টাল ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেবে জুবেরকে।

দরজা খুলে উঁকি দিয়ে করিডোরে তাকাল জেসমিন। কেউ নেই। নিঃশব্দ পায়ে এগোল সে। লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। এখন কেউ যদি দেখে ফেলে...

জেসমিন জানে না, একজন লোক দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে, মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে।

বোতাম টিপলো জেসমিন। উঠে আসছে লিফট। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে। হন হন করে ফিরে এল নিজেদের স্যুইটে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জুবের। থমকে দাঁড়াল জেসমিন। জুবেরের কাঁধে সানিয়া। 'কেউ আছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জুবের।

মাথা নাড়ল জেসমিন। পিছিয়ে গেল এক পা। হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত।

'সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াও,' আদেশের সুরে বলল জুবের। 'কাউকে উঠতে দেখলে খুক খুক করে কাশবে।' জেসমিন নড়ছে না দেখে চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, 'যাও!'

স্যুইট থেকে আবার বেরিয়ে এল জেসমিন। পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোল। রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। কেউ নেই সিঁড়িতে। পিছনে শব্দ হতেই ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল, স্যুইট থেকে কাঁধে লাশ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে জুবের, লিফটের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। বিস্ফারিত চোখ দুটো সরিয়ে নিল জেসমিন। সিঁড়ির দিকে চোখ রাখল আবার। শব্দ শুনে বুঝল, লিফটে লাশ তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করছে জুবের। এক সেকেণ্ড পরই ঘড় ঘড় আওয়াজ হল, ওপরে উঠে যাচ্ছে লিফট। ঘুরে দাঁড়াল সে। টলতে টলতে ফিরে এল স্যুইটে। থর থর করে কাঁপছে হাত দুটো,

কোন রকমে বন্ধ করল দরজাটা। কবাটে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। একটু পর টুক টুক করে টোকা পড়ল দরজায়। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল জেসমিন। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল জুবের।

পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা। হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল জুবের। তারপর রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। 'টপ ফ্লোরে রেখে এসেছি লিফট। কেউ কিছু টের পায়নি।'

'লিফটের গায়ে কোথাও তোমার হাতের ছাপ নেই তো?'

'শয়ে শয়ে লোকের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে,' বলল জুবের। 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

'পুঁতিগুলো...'

'ফেলে দিয়েছি।'

'সানিয়ার আর কোন জিনিস স্যুইটে নেই তো?'

'নেই।'

'ওর হাতব্যাগ? সেটা কোথায়?'

'নিয়ে আসেনি।'

'ঠিক মনে আছে তোমার?'

'বললাম তো।'

মনে মনে এই প্রথম একটু স্বস্তি বোধ করল জেসমিন। সানিয়া যে এই স্যুইটে খুন হয়েছে তা ধরার কোন উপায় নেই পুলিশের। আলম পরিবারের খ্যাতি আছে, সমাজে প্রতিপত্তি আছে, তাদেরকে সন্দেহ করার কথা সহজে কারো মনেও আসবে না।

আজ রাতে আর কিছু ঘটবে না ভেবে খিলানের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল শফিক। আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। চোখ দুটো বুঁজে আসতে চাইছে, এই সময় খুট করে শব্দ হল। মাথা তুলে করিডোরে তাকাতেই জেসমিনকে দেখতে পেল সে। দরজা খুলে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কেন যেন ভয়ংকর কিছু একটা ঘটার আশংকায় সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠল শফিক। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। ইতিমধ্যে লিফটের বোতাম টিপে দিয়েছে জেসমিন। আবার ফিরে আসছে স্যুইটে। চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠল শফিকের। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর প্রথমে জেসমিন, তারপর কাঁধে সানিয়াকে নিয়ে জুবেরকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রচণ্ড উত্তেজনায় নিজের অস্তি-ত্বের কথাও মনে থাকল না তার। ক্যামেরার কথা যখন মনে পড়ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে লিফটের দরজা, ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে।

নেশাগ্রস্ত হলেও, ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হল না শফি-কের। মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে শুরু করল কয়েকটা প্রশ্ন। সানিয়া জ্ঞান হারাল কেন? অচেতন শরীরটা লিফটে রেখে আসার কারণ কি? রহস্যটা যাই হোক, এর সাথে টি আলমের স্ত্রী জেসমিনও জড়িত। সানিয়াকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বা বেশি মদ গিলিয়ে দিয়ে অচেতন করা হয়েছে, যাতে ধর্ষণ করতে সুবিধে হয়? জুবেরের হয়ত সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু সৎমায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অচেতন সানিয়াকে লিফটে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে। দুর্নামের ভয়ে ছেলেকে সাহায্য করেছে জেসমিন...ব্যাখ্যাটা মনে ধরল শফিকের। খিলান থেকে নেমে এল সে। সানিয়ার অবস্থাটা একবার দেখা দরকার।

লিফট নামাতে গেলে আওয়াজ হবে ভেবে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল শফিক। কিন্তু চার তালায় উঠতেই দম ফুরিয়ে গেল তার। চব্বিশ ঘণ্টায় গড়ে তিন বোতল মৃতসঞ্জীবনী সুধা খেয়ে শরীরের বারোটা বাজিয়ে বসে আছে সে। লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল, বোতাম টিপতেই নেমে আসতে শুরু করল সেটা। সম্ভবতঃ টপ ফ্লোরের কোন খালি কামরায় সানিয়াকে রেখে এসেছে জুবের, ভাবল সে। নেমে এল লিফট। দরজা খুলে গেল। পরমুহূর্তে আঁতকে উঠে দু'পা পিছিয়ে এল শফিক। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল।

লিফটের ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশটা, পা দুটো ভাঁজ করা, নীল শাড়ি সরে গিয়ে ফর্সা হাঁটু দুটো উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিম ভয়ের একটা স্রোত নেমে এল। নেশার ঘোর কেটে গেছে, কিন্তু চোখ দুটোকে তবু বিশ্বাস করতে পারছে না সে। গলায় কিসের দাগ ওটা? ভাল করে তাকাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে সানিয়াকে। হঠাৎ পালাবার একটা তাগাদা অনুভব করল সে। কিন্তু বিস্ময় আর আতংকে পাথর হয়ে গেছে, এক চুল নড়তে পারল না।

ধাক্কাটা সামলাতে আরো কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল শফিকের। টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল সে, সিঁড়ির দিকে এগোল। কিভাবে নিচে নেমে এল, বলতে পারবে না। রিসেপশনে বসা নাইট ক্লার্ক তাকে দেখে বিড় বিড় করে ব্যাটা মাতাল বলল, সেটাও তার কানে ঢুকল না। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দিকভ্রান্তের মতো হাঁটতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পর খেয়াল হল, তার হোটেলের উল্টো দিকে হাঁটছে সে।

নিজের হোটেলে ফিরে এসে চোখে মুখে পানির ছিটে দিল শফিক। খাটের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরাল। ঘরে আরেকটা

মদের বোতল থাকলেও, সেটার কথা মনে পড়ল না তার। হোটেল রেনবোয় যা যা দেখেছে সব এক এক করে স্মরণ করল সে।

সন্দেহ নেই, সানিয়াকে খুন করা হয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ল এডভোকেট জহির নিযামের কথা। সকালের সম্পাদক এই ধরনের একটা গন্ধ পেলে ধেই ধেই নাচতে শুরু করে দেবে। পত্রিকার সার্কুলেশন রাতারাতি তিন গুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল শফিক। বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। টি আলম একজন কোটিপতি। ক্যামেরার ছবিগুলোর সাহায্যে অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারবে সে, টি আলমের স্যুইটে বেলা চারটের সময় ঢুকেছিল সানিয়া। মেয়েটাকে ঠিক কখন খুন করা হয়েছে পরীক্ষা করে অনায়াসেই তা জানা সম্ভব—এ-ব্যাপারে পুলিশ সার্জেনরা বড় একটা ভুল করে না। তার নিজের ধারণা, চারটে থেকে পৌনে পাঁচটার মধ্যে খুন করা হয়েছে সানিয়াকে। সে সময় স্যুইটেই ছিল জুবের আলম।

উঁহুঁ, জহির নিযামকে খবরটা দিয়ে লাভ নেই। পত্রিকার সার্কুলেশন দশগুণ বাড়লেও তো এক পয়সা বেতন বাড়াবে না লোকটা। তারচেয়ে খবরটা সরাসরি টি আলমকে জানালে নগদ কিছু প্রাপ্তির ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। সে যদি মুখ খুলবে না বলে কথা দেয়, ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে, পারিবারিক মর্যাদার কথা ভেবে পকেট উজাড় করে এই দুর্ভাগা সাংবাদিক বেচারাকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই রাজি হবেন টি আলম। আর রাজি হলেই, বাকি জীবনটার জন্যে তাকে আর চিন্তা করতে হয় না। আচ্ছা, কত টাকা চাওয়া যেতে পারে? টি আলমের টাকার কোন কমতি নেই। লাখ দশেক? দশ লাখ কি এমন টাকা! টি আলমের হাতের ময়লা। না, কম চেয়ে

পরে আফসোস করার মানে হয় না। পাবার যখন ষোল আনা সম্ভাবনা, তখন বেশি করে চাওয়াই ভাল। বিশ লাখ। বিশ লাখ টাকা পেলে খুনের কথাটা বেমালুম ভুলে যাবে সে।

ঢাকার বুকে ছোট্ট একটা বাড়ি, একটা চাকর···চোখের সামনে এক এক করে আরো কত কি ভেসে উঠতে দেখল শফিক। সকালের চাকরী চুলোয় যাক। তরুণ, চটপটে ফটোগ্রাফারদের সাথে পাল্লা দেবার আর দরকার হবে না তার। বাড়ি ইত্যাদি কেনার পর বাকি টাকা ব্যাংকে রেখে দেবে সে, বছরে যা সুদ পাবে তাই দিয়ে বাকি জীবনটা হেসে খেলে কেটে যাবে তার।

কিন্তু টি আলম যদি বলেন, ব্ল্যাকমেইল। যদি টাকা দিতে রাজি না হন তিনি? যদি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেন? পুলিশের কথা মনে হতেই ভয়ে কেঁপে উঠল শফিকের বুক।

তারপর ভাবল, এত ব্যস্ত হবার কি আছে? চুপটি করে বসে থাকলেই তো হয়। পুলিশ জুবের আলমকে ধরবেই। তখন ছবিগুলো তার কাছ থেকে কিনে নেয়ার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠবে আলম পরিবার।

সেটাই ঠিক করল শফিক—সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে সে।

ছয়

সকাল সোয়া ছ'টা। হোটেল রেনবো। চারতালা।

স্টোররুমে যাবার পথে একজন রুম বয় দেখল, লিফটের দরজাটা খোলা রয়েছে। সেটা বন্ধ করার জন্যে এগোল সে। দশ

সেকেণ্ড পর তার আর্তচিৎকার শুনে সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে এল হোটেলের সিকিউরিটি গার্ড সাঈদ চৌধুরী এবং সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদ।

হতচকিত ভাবটা প্রথমে কাটিয়ে উঠল সাঈদ। 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত লাশের গায়ে হাত দেয়া উচিত হবে না,' সহকারী ম্যানেজারকে বলল সে। 'আর, লিফটের দরজায় একটা নোটিশ টাঙাতে হবে— যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে লিফট অচল।'

'মেয়েটা কে বলুন তো?' কাঁপা গলায় বলল সহকারী ম্যানেজার। 'চেনা চেনা লাগছে...'

'সিনেমা পত্রিকাগুলোয় প্রায়ই তো এর ছবি ছাপা হত, সে-জন্যেই চেনা চেনা লাগছে। এর নাম ইফফাৎ সানিয়া...' ব্যস্ত হয়ে উঠল সাঈদ, 'আপনি বরং দেরি না করে পুলিশে খবর দিন।'

ফোন পেয়ে দশ মিনিটের মধ্যে কক্সবাজার থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া জীপ হাঁকিয়ে হাজির হল। দশাসই চেহারা ইন্সপেক্টরের, পাকানো গোঁফ, মস্ত এক ভুঁড়ি আছে, কিন্তু ভাটার মতো চোখ জোড়ায় বুদ্ধির ঝিলিক। লাশ দেখেই ওটা ইফফাৎ সানিয়ার বলে চিনতে পারল সে। লাশের হাত ছুঁয়ে শরীরের উত্তাপ এবং কাঠিন্য অনুভব করল। ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে গেছে লাশ। অনুমান করল, কম পক্ষে বারো ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে মেয়েটা। এই খুন নিয়ে সারা দেশে মহা শোরগোল পড়ে যাবে, বুঝতে অসুবিধে হল না তার। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠল। ধারণা করল, লিফটে নয়, হোটেলের ছশো কামরার কোন একটায় খুনটা করা হয়েছে। তারপর সুযোগ বুঝে লাশটা লিফটে এনে রেখেছে খুনী। হোটেলে স্বনামধন্য দেশী-বিদেশী অতিথিরা রয়েছেন, কাজেই খুব

সাবধান, কাউকে বিরক্ত না করে তদন্তের কাজ চালাতে হবে।

একই গাড়িতে সহকারী ইন্সপেক্টর সনাতন এবং ফটোগ্রাফার জহীরও পৌঁচেছে। জহীরকে লাশের ফটো তোলার নির্দেশ দিল ইন্সপেক্টর। সহকারী ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, লিফট থেকে সরিয়ে খালি একটা বাথরুমে রাখতে হবে লাশ। কোন কামরাই খালি নেই।

ইতিমধ্যে পুলিশ সার্জেন ডাক্তার সতীশও পৌঁছে গেছে। ইন্সপেক্টরের সমবয়সী। বাথরুমে গিয়ে লাশটা পরীক্ষা করতে শুরু করল সে। তার সাথে একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টও পৌঁচেছে, লিফট থেকে হাতের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করছে সে। সনাতন আর সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদকে নিয়ে নিচের লবিতে নেমে এল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। সুলতান আহমেদ নিজের অফিস ঘরটা ছেড়ে দিল তাকে। জেরা করার জন্যে দারোয়ানকে ডেকে পাঠাল ইন্সপেক্টর।

'ঠিক কখন হোটেলে ঢুকছিল মেয়েটা, বলতে পার?' দারোয়ান আসতেই তাকে প্রশ্ন করল সে।

'এই...চারটের দিকে, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে উঠল ইন্সপেক্টরের। 'বল কি! একটানা এতক্ষণ ...প্রায় চোদ্দ ঘন্টা হোটেলে ছিল? কাউকে খুঁজেছিল কিনা, কার কামরায় ঢুকেছিল—সব বল আমাকে'

'কাউকে খোঁজেননি, স্যার। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গিয়েছিলেন।'

'সিঁড়ি বেয়ে? তার মানে, লিফট ব্যবহার করেনি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দারোয়ান। 'না।'

'তার মানে, চারতালায় যায়নি,' চিন্তিতভাবে বলল ইন্সপেক্টর। 'তা গেলে লিফট ব্যবহার করত। সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, তাই না? হয় দোতালায়, নয়তো বড়জোর তিন তালায় উঠেছিল।' দারোয়ানের দিকে তাকাল আবার। 'ও কাউকে খোঁজেনি, কিন্তু ওকে কেউ খুঁজেছিল কিনা বলতে পার?'

'জী, স্যার। একজন সাংবাদিক...নামটা...শফিকুর রহমান... সব সময় মদ খেয়ে থাকেন, ঢাকা থেকে এসেছেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সানিয়া হোটেলে আছে কিনা। বললাম, আছেন...'

'চিনি। একটা মাসিক পত্রিকার প্রতিনিধি,' নোট বুকে লিখল ইন্সপেক্টর, 'শফিকুর রহমান বাবু, মাতাল, সাংবাদিক—সকাম। সাড়ে ছ'টায় ইফফাৎ সানিয়ার খোঁজ করেছিলেন'। 'কেন খোঁজ কর-ছিলেন, বলেন নি কিছু?'

'না, স্যার...' কথাটা বলে ইতস্তত করতে লাগল দারোয়ান। ইন্স-পেক্টরের চোখে সন্দেহ ফুটে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল সে, 'শফিক সাহেব আমাকে দশ টাকা বখশিশ দিয়ে বলেছিলেন, আলম পরিবারের কেউ ফিরে এলে আমি যেন তাঁকে জানাই...'

'আলম পরিবার? মানে, টি আলম...?' ভুরু কুঁচকে উঠল ইন্স-পেক্টরের।

'জী, স্যার।'

নোট বুকে তথ্যটা লিখে নিল ইন্সপেক্টর। 'আর কেউ খোঁজ করেনি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দারোয়ান। তাকে বিদায় করে দিয়ে চার তালায়, করিডোরের একটা ফোনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে

বলল সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদকে। যোগাযোগ হতে করিডোরে পাহারায় দাঁড়ানো কনেস্টেবলকে বলল, 'সার্জেন সতীশ সরকারকে ডেকে দাও।'

অপর প্রান্তে সার্জেনের গলা পাওয়া গেল। 'ইন্সপেক্টর?'

'খবর হল কিছু?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'এই এক ব্যারাম তোমার। এ কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি যে চাইলেই খবর তৈরি করে দেব।'

'আহা, চট কেন, ডাক্তার। বলছিলাম কি…' গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে, একজন চটে উঠলে আরেকজন কাদার মতো নরম হয়ে যায়, বোধহয় সেজন্যেই আজও টিকে আছে ওদের বন্ধুত্ব।

'তুমি আবার কি বলবে। বলব তো আমি। শোনো বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে খুন হয়েছে মেয়েটা,' বলল সার্জেন সতীশ, 'তার আগে বা পরে নয়।'

'হোটেলে ঢুকেছিল চারটের সময়…'

'তাহলে চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। আরো শোনো, রশি দিয়ে, পাকানো রশি দিয়ে দম বন্ধ করে খুন করা হয়েছে। পাকানো রশির নকশার দাগ রয়েছে গলার চামড়ায়। রশিটা খুঁজে বের করা কঠিন হবেবলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, পর্দার রশি ইহবে।"

'নকশার দাগের ছবি চাই আমি—এখুনি। জহীরকে বল…'

'কিন্তু এখন ফটো তুলতে দিলে আমার কাজের দেরি হয়ে যাবে…'

'তোমাকে নিয়ে মহা যন্ত্রণায় পড়লাম দেখছি।' চটে উঠল ইন্সপেক্টর। 'ফটোটা জরুরী, বুঝলে?'

'আহা, চট কেন ইন্সপেক্টর। বলছিলাম কি…'

'আর কোন খবর আছে?'

'সেই কথাই তো বলছিলাম। শোনো, মেয়েটার আঙুলের নখে খানিকটা চামড়া লেগে রয়েছে—বাঁ হাতের আঙুলে। খুন হবার সময় খুনীকে বোধহয় খামচি দিয়েছিল। নখের ভেতর চামড়ার পরিমাণ দেখে আমার ধারণা হচ্ছে, খুনীর কব্জিতে বা হাতের কোথাও গভীর তিনটে দাগ না থেকেই পারে না।'

'ভেরি গুড,' রিসিভার রেখে দিল ইন্সপেক্টর। সহকারী সনাতন একটা চেয়ারে বসে সব শুনছিল, তার দিকে তাকাল, বলল, 'মনে হচ্ছে সহজেই সমাধান করতে পারব। কোন হোটেলে উঠেছিল মেয়েটা, খোঁজ নাও। কাল চারটে পর্যন্ত কোথায় ছিল, কার কার সাথে কথা বলতে দেখা গেছে, সব খবর যোগাড় কর। তারপর,' অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠুকল কয়েকবার, 'ওই শফিকুর রহমান বাবু, সাংবাদিক ভদ্রলোককে খুঁজে বের কর।' সহকারী কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে বলল, 'হোটেলের সিকিউরিটি গার্ড সাঈদ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিয়ো এখানে।'

ফিটফাট বাবু সেজে কামরায় ঢুকল সাঈদ।

'বসুন,' সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল ইন্সপেক্টর। 'আপনি তো মেয়েটাকে হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলেন, তাই না?'

'না তো। চারটে থেকে করিডোরে টহল দেয়া আমার কাজ, কালও তাই দিচ্ছিলাম।'

'তাহলে তাকে দেখতে না পাবার কারণ কি?'

'করিডোর তো আর একটা নয়। আমি হয়ত তখন চারতালার কিংবা পাঁচ তালার কোন করিডোরে ছিলাম…'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইন্সপেক্টর বলল, 'আমার বিশ্বাস, বাইরের কোন লোক নয়, হোটেলে যারা থাকে তাদের মধ্যেই কেউ

খুন করেছে মেয়েটাকে। সার্জেন বলছেন, চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে কাজটা সারা হয়েছে। খুন করেই লাশটাকে লিফটে রেখে আসা সম্ভব ছিল না—সুযোগ এবং পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে খুনীকে।' একটা সিগারেট ধরাল সে। 'হোটেলে ঢুকে লিফট ব্যবহার করেনি মেয়েটা, তার মানে দোতালায় বা তিন তালায় কারো কাছে এসেছিল সে। নিশ্চয়ই চার তালায় বা আরো ওপর তালায় নয়, তা যদি হত তাহলে সিঁড়ি বেয়ে উঠত না সে। এখন, আমি জানতে চাই, শেষবার কখন ব্যবহার করা হয়েছে লিফট।'

সিকিউরিটি গার্ডের চেহারায় সবিনয় ভাব ফুটে উঠলেও, হাসিটার মধ্যে একটু গর্ব লক্ষ্য করল ইন্সপেক্টর। বলল, 'আপনি জানতে চাইবেন ভেবে খবরটা আমি এরই মধ্যে যোগাড় করে ফেলেছি, ইন্সপেক্টর। তিনটের পর অটোমেটিক হয়ে যায় লিফট। তখন থেকে নিচের তালায়, নাইট ক্লার্কের একেবারে চোখের সামনে থাকে ওটা। কাল রাতে অটোমেটিক হয়ে যাবার পর লাল আলোটা একবার জ্বলে উঠতে দেখেছিল সে—কিন্তু সেটা তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ঠিক কখন তা সে মনে করতে পারছে না।'

'লাল আলো জ্বলে ওঠা মানে লিফটাকে কেউ ওপরে নিয়ে যেতে চাইছিল,' নড়েচড়ে বসল ইন্সপেক্টর। 'তারপর?'

'লাল আলোটা আরেকবার জ্বলে উঠেছিল—মিনিট দশেক পর। তার মানে, লিফটটাকে আরো ওপরে তুলছিল কেউ। আমার মনে হয়, খুনীই ওই সময় ব্যবহার করছিল ওটা। ওই শেষ, তারপর আর আলো জ্বলেনি।'

নোটবুকে কয়েকটা তথ্য লিখে নিল ইন্সপেক্টর। 'করিডোরে পাহারা দেবার সময় সন্দেহজনক কাউকে দেখেছিলেন?'

'সন্দেহজনক কাউকে দেখিনি,' বলল সাঈদ। 'তবে, মিঃ টি আলমের স্যুইটের সামনে একজন সাংবাদিক-ফটোগ্রাফারকে দেখেছিলাম। ভদ্রলোকের নাম শফিকুর রহমান...'

'হুঁ, ভদ্রলোক দেখছি কৌতূহলী করে তুলছেন আমাকে।' গম্ভীর সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'তা, কি করছিলেন তিনি ওখানে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, টি আলম স্যুইটে আছেন কিনা। আমি তাকে বললাম, নেই। তখন, এই পাঁচটা মত বাজে।'

পেন্সিলের ডগা দিয়ে নাক চুলকাল ইন্সপেক্টর। 'তার মানে, সানিয়া খুন হবার একটু পরই। তার মানে, খুনের আগে এবং পরেও সাংবাদিক ভদ্রলোক এই হোটেলেই ছিলেন।' স্বগতোক্তির মতো শোনাল কথাগুলো। 'আমার হয়ে একটু কষ্ট করুন, প্লীজ। হোটেল থেকে কখন বেরিয়ে গেছেন তিনি, খোঁজ করে সেটা এখুনি আমাকে জানান।' সাঈদ কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে চোখ বুঁজে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। পাঁচ মিনিট পর চোখ মেলে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

সাঈদ ফিরে এসে বলল, 'ভোর তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছেন তিনি, নাইট ক্লার্ক বলল। সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতাল থাকেন, টলতে টলতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি সে।'

কয়েক সেকেণ্ড মুখে কথা যোগাল না ইন্সপেক্টরের। তারপর বলল, 'প্রায় ওই একই সময় লাশটাও লিফটে তোলা হয়েছে। ভদ্রলোক দেখছি চিন্তিত করে তুলেছেন আমাকে।' নোটবুকের খোলা পাতার দিকে তাকাল সে। 'শ্বাসরোধ করার জন্যে সম্ভবতঃ পর্দার পাকানো রশি ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, বলতে পারেন, হোটে-

লের সবগুলো কামরাতেই কি ও-ধরনের রশি আছে ?'

'ঠিক বলতে পারছি না, তবে খোঁজ করলেই জানা যাবে…'

'খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি জানান আমাকে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সাঈদ। চোখ বুঁজল ইন্সপেক্টর। কিন্তু পায়ের শব্দে তখুনি চোখ মেলতে হল তাকে। দেখল, পুলিশ-ফটোগ্রাফার জহির ঢুকছে কামরায়।

টেবিলে, ব্লটিং পেপারের ওপর ভিজে একটা ফটো রাখল জহীর। 'এর বেশি হল না, স্যার। এর চেয়ে ভাল প্রিণ্ট পেতে হলে স্টুডিওতে যেতে হবে।'

ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল ইন্সপেক্টর। 'হুঁ, কিন্তু এটাও খুব একটা মন্দ হয়নি। নকসা কাটা রেশমী রশি, দেখেই চেনা যাচ্ছে। খুঁজে পেলে সনাক্ত করা কঠিন হবে না।'

ফিরে এল সাঈদ। হাতে এক জোড়া পর্দার রশি—একটা লাল, আরেকটা সবুজ। টেবিলের ওপর রাখল ওগুলো, বলল, 'দোতালা আর তিন তালা ছাড়া আর কোথাও এই রেশমী রশি ব্যবহার করা হয় না।'

দুটো রশিই পরীক্ষা করল ইন্সপেক্টর। তারপর সবুজটা রেখে দিয়ে লালটা দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কোন্ তালার ?'

'তিন।'

'হুম।' চোখ দুটো বিস্ফারিত করে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ইন্সপেক্টর। 'আমার ধারণাই ঠিক। এ-ধরনের একটা রশির সাহায্যেই দম আটকে মারা হয়েছে মেয়েটাকে। তার মানে, খুনটা তিন তালার কোন কামরাতেই হয়েছে।' সাঈদের দিকে তাকাল সে। 'সিকিউরিটি সাহেব, তিন তালার বোর্ডারদের একটা

তালিকা তৈরি করে দিন আমাকে—জলদি।'

হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল ইন্সপেক্টর। অপর প্রান্ত থেকে সহকারী সনাতন বলল, 'ইকফাৎ সানিয়ার হোটেল থেকে কথা বলছি আমি। তার ম্যানেজার, মাহবুব হোসেন, আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'আর কিছু?'

'কাল বিকেলে, এই সাড়ে তিনটের দিকে, সানিয়ার সাথে সৈকতে নাকি কথা বলেছিল টি আলমের ছেলে জুবের আলম,' বলল সনাতন। দু'জন লোক দেখেছে ওদেরকে।' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানতে চাইল সে, 'লাইনে আছেন তো, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

'আছি। ভাবছিলাম। শোন, শফিকুর রহমানকে যেভাবে হোক খুঁজে বের কর। জরুরী ব্যাপার, বুঝলে?' রিসিভার নামিয়ে রেখে সাঈদের দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'টি আলমের ছেলে জুবের আলম সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

একটু অবাক হলেও চটপট উত্তর দিল সাঈদ, 'বিশ বাইশ বছর বয়স। খুবই শান্ত। ভদ্র। কেন বলুন তো?'

জবাব না দিয়ে গোলাম কিবরিয়া বলল, 'কাল বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কোথায় ছিল সে, খোঁজ নিয়ে জানান আমাকে।'

'ঠিক আছে,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সাঈদ। ফিরে এল তিন মিনিট পরই। বলল, 'চারটে বাজতে কয়েক মিনিট আগে হোটেলে ফেরেন জুবের আলম। তার একটু পরই ফেরেন মিসেস জেসমিন আলম।'

'কে বলল? রিসেপশনিস্ট?'

'না, রিসেপশনে যে কেরাণী বসে সে,' বলল সাঈদ। 'মিসেস জেসমিন তার কাছ থেকে চাবি চেয়েছিলেন। কেরাণী তাকে জানায়, এইমাত্র চাবি নিয়ে ওপরে গেছেন জুবের আলম।'

পেন্সিলের পেছনের রাবার দাঁত দিয়ে কামড়ে কি যেন চিন্তা করল ইন্সপেক্টর, তারপর বলল, 'হুঁ'। তার মানে, সানিয়া যখন খুন হয় তখন জুবের আলমের সাথে একজন ছিল—তার সৎমা।'

'আপনি কি স্যার জুবের আলমকে সন্দেহ...'

'আরে না। সে যে কাজটা করেনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে, সন্দেহের বাইরে কাউকেই রাখতে চাই না আমি। ভাবছি শফিকুর রহমানের কথা। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?' টেবিলের ওপর পেন্সিলটা রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। 'আরো একটা বিষয় চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ কি? কেন খুন হল মেয়েটা?' হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল সে। 'ওহে ডাক্তার, তোমার মেজাজ ভাল তো?'

'আবার কি চাও তুমি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল সার্জেন সতীশ।

'মেয়েটাকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা জানতে চাই।'

'না। কোন চেষ্টাই করা হয়নি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আবার চোখ বুঁজল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া।

ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়, কিন্তু চোখ বুঁজে আরো প্রায় আধঘণ্টা

বিছানায় পড়ে থাকল জুবের। প্রথমেই মনে পড়ল জিনেতের কথা। পরমুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে ভাবল সে, প্রথমে সানিয়া বা পুলিশের কথা মনে না পড়ে জিনেতের কথা মনে পড়ল কেন। সানিয়া…পুলিশ… মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার—অঘটনটা ঘটে যাবার পর তার সাথে পরিচয় হল জিনেতের। আচ্ছা, পুলিশ কি লাশের খবর পেয়ে গেছে? তা পেলে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে তদন্ত। কিন্তু কোন্ সূত্র ধরে এগোবে তারা? উদ্দেশ্যহীন একটা খুনের কিনারা কিভাবে করবে পুলিশ?

এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল জুবের। লাশটা নিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানা দরকার তার। বিপদ আসতে দেখলে সাবধান হবার একটা সুযোগ হয়ত পাবে। জিনেতের সাথে পরিচয় হবার পর ধরা পড়ার কোন ঝুঁকি নিতে পারে না সে।

শাওয়ার সারল জুবের। দাড়ি কামাল। বাঁ হাতের তিনটে আঙুলের খাঁজে ক্ষত চিহ্নগুলো কালচে হয়ে আছে, সেগুলো ঢাকার জন্যে সুতির একটা স্যুট পড়ল সে। অর্ডার দিল ব্রেকফাস্টের। রুম-সার্ভিস ব্রেকফাস্ট নিয়ে কামরায় ঢুকতে তার চেহারাটা আড়চোখে লক্ষ্য করল সে। কেমন যেন নির্বিকার। দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। অগত্যা জিজ্ঞেস করল তাকে, 'একটু যেন হৈ-চৈ কানে এল, কি ব্যাপার?'

'ঠিক বলতে পারব না, স্যার।'

রুম-সার্ভিসকে বিদায় করে দিয়ে দ্রুত ব্রেকফাস্ট সারল জুবের। তারপর বেরিয়ে এল স্যুইট থেকে। প্রথমেই নজরে পড়ল লিফটের গায়ে একটা নোটিশ টাঙানো রয়েছে—'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে লিফট অচল।' তার মানে লাশটা আবিষ্কার করেছে ওরা।

সারা শরীর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ঝিন ঝিন করে উঠল তার। আবার উত্তেজিত হবার মোহটা জেগে উঠল তার মনে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। হোটেলের কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। মনটা নিরাশ হয়ে গেল তার। ভাবল, লিফটের ভেতর একটা লাশ পাওয়া এদের কাছে যেন কোন ব্যাপারই নয়। টেলিফোন বুথ পেরিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এখান থেকে প্রায় পুরোটা লবি দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোন ছুটোছুটি বা উত্তেজনার ভাব নেই। আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে স্টল থেকে একটা খবরের কাগজ কিনল সে। তারপর চেয়ার টেনে বসে ইঙ্গিতে একজন বেয়ারাকে ডেকে এক কাপ কফির অর্ডার দিল। হোটেলে ঢোকার পথটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

মিনিট পনের পর লবিতে দু'জন লোক ঢুকল। দশাসই চেহারা একজনের, পরনে পুলিশ ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম। চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। সাথের লোকটাকে চিনতে পারল জুবের, হোটেলের সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদ। দু'জনে ফিস ফিস করে কি যেন আলাপ করে অদৃশ্য হয়ে গেল রিসেপশন কাউন্টারের ওপারের কামরায়। হুঁ, ভাবল জুবের, ওখানেই তাহলে আস্তানা গেড়েছে পুলিশ।

এক মিনিট পরই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর সনাতন আর সানিয়ার এজেন্ট মাহবুব হোসেন। লাশ সনাক্ত করার জন্যে মাহবুব হোসেনকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল সনাতন। অফিস কামরায় ঢুকল তারা। সোনালি কেস থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরাল জুবের। উৎসুক চোখে তাকাল অফিস কামরার দিকে। কি হচ্ছে ওখানে?

মাহবুব হোসেনকে এর আগেও একবার প্রশ্ন করেছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। বেচারার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে তার সাথে খুব নরম ব্যবহার করতে হল তাকে। টেলিফোনে পাওয়া সানিয়ার সেই মেসেজটার কথা মাহবুব আগেই বলেছে ইন্সপেক্টরকে। সহকারীকে দিয়ে খোঁজও নিয়েছে ইসপেক্টর। কিন্তু অনুসন্ধানের লোকটা কিছু-তেই মনে করতে পারেনি, কে পাঠিয়েছিল মেসেজটা। শুধু মনে আছে, সেটা একটা টেলিফোন কল ছিল।

'মেসেজটা যে সানিয়া পাঠায়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই,' মাহ-বুবকে বলল ইন্সপেক্টর। 'হাতে কিছু সময় পাবার জন্যে খুনীই পাঠিয়েছিল ওটা।' ইন্সপেক্টরের চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হল, 'এবার বলুন, এই খুনের উদ্দেশ্য কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'উদ্দেশ্য?' হতভম্ব দেখাল মাহবুব হোসেনকে। 'সানিয়ার মতো একটা নিরীহ, লক্ষ্মী মেয়েকে খুন করার পেছনে কার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ইন্সপেক্টর সাহেব? বদ্ধ কোন উন্মাদের কাজ এটা…' হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সে।

'টি আলম সাহেব তাহলে সানিয়ার সাথে কথা বলতে চেয়েছি-লেন, তাই না?' বলল ইন্সপেক্টর।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল মাহবুব হোসেন। 'জ্বী। ছ'টার সময় এই হোটেলেরই বারে সানিয়ার সাথে দেখা করার কথা আগেই ঠিক হয়েছিল আমার, খবরটা ওকে তখনই দেব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ও রামুতে বেড়াতে গেছে শুনে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। যাই হোক, তখুনি আমি রামুতে চলে যাই। কিন্তু সেখানে কোথাও সানিয়াকে পাইনি…'

'পাবার কথাও নয়, কারণ ততক্ষণে মারা গেছে সে।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইন্সপেক্টরের একটা হাত চেপে ধরল মাহবুব হোসেন। 'সানিয়াকে আমি নিজের মেয়ের মতো করে আগলে আগলে রাখতাম, ইন্সপেক্টর সাহেব। পাগল-ছাগল যাই হোক, ওর খুনীকে আপনি খুঁজে বের করুন।'করুণ আবেদনের সুরে বলল সে। 'আমি দেখতে চাই, ওর খুনী শাস্তি পেয়েছে। তা না হলে সানিয়ার আত্মাও শান্তি পাবে না...'

'খুনীর রেহাই নেই,' দৃঢ় গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'ধরা তাকে পড়তেই হবে। আরেকটা প্রশ্ন, আচ্ছা সব মেয়েই তো হাতব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরোয়। নিশ্চয়ই সানিয়ারও সে অভ্যেস ছিল?'

'ছিল।'

'কিন্তু লিফটের ভেতর লাশের সাথে কোন হাতব্যাগ পাওয়া যায়নি। অবাক ব্যাপার, তাই না?

'হাতব্যাগ পাওয়া যায়নি? বলেন কি! ইদানিং যে ব্যাগটা ব্যবহার করছিল সানিয়া, সেটা আমার প্রেজেন্ট করা। লিপস্টিক, পাউডার, রুমাল এইসব রাখত। ব্যাগের গায়ে ওর নাম লেখা আছে...'

'তাহলে বোধহয় বেরোবার সময় নিজের হোটেলে রেখে এসেছিল। সেখানে ওটার খোঁজ করা দরকার...'

'অসম্ভব!' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল মাহবুব হোসেন। 'হাতব্যাগ ছাড়া কোথাও বেরোয় না ...বেরোত না সানিয়া।'

তথ্যটা লিখে নিল ইন্সপেক্টর।

কি যেন চিন্তা করছিল মাহবুব হোসেন। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আচ্ছা, ওর গলায় পুঁতির হারটা দেখলাম না যে?'

'পুঁতির হার?' সতর্ক হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর।

'ওই পুঁতির হারটার ওপর অদ্ভুত একটা দুর্বলতা ছিল সানিয়ার,'

বলল মাহবুব হোসেন। 'সব সময় গলায় পরে থাকত। লাশ পরীক্ষা করার সময় সার্জেন বোধহয় খুলে রেখেছেন ওটা?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'লাশের সাথে কোন পুঁতির হার পাওয়া যায়নি। তবু ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখব।' একটা সিগারেট ধরাল সে। 'আর কোন তথ্য দিতে পারেন নাকি? কোন প্রেমিক ছিল কিনা…?'

'না। অত্যন্ত লাজুক মেয়ে ছিল সানিয়া। তাছাড়া, সময় পেত কোথায়। অভিনয় ছিল তার সাধনা, সারাটা সময় ওর পেছনেই কাটিয়ে দিত। প্রেম বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথাই ঘামাত না সে।'

মাহবুব হোসেনকে বিদায় করে দিয়ে আবার চোখ বুঁজল ইন্স-পেক্টর। খানিক পর চোখ মেলে সহকারী সনাতনকে পাঠাল সানিয়ার হাতব্যাগের খোঁজে। তারপর অফিস কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল লবিতে। ইঙ্গিতে দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'সানিয়াকে তো হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলে তুমি—মনে করে দেখ তো, তার গলায় পুঁতির কোন হার ছিল কিনা?'

খানিক মাথা চুলকে বলল, দারোয়ান, 'হ্যাঁ, স্যার, মনে পড়েছে। ছিল। বেশ বড় সাইজের পুঁতি, এক একটা আখরোটের মতো…'

দারোয়ানের পিঠ চাপড়ে দিল ইন্সপেক্টর।

দূর থেকে বসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল জুবের। হোটেলের সিকি-উরিটি গার্ড সাঈদ লবিতে ঢুকল এই সময়। জুবেরের দিকে চোখ পড়তেই তার চেহারায় একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল। ইন্সপেক্টরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করল তারা। তারপর হঠাৎ করেই, দু'জন একযোগে, ঘাড় ফিরিয়ে সোজা

তাকাল জুবেরের দিকে।

হার্টবিট বেড়ে গেল জুবেরের। হঠাৎ খেয়াল হল, লবিতে আর কেউ নেই, বোকার মতো একা বসে আছে সে। হাতের তালু ঘেমে উঠল। বুঝতে পারল, এভাবে একা বসে থাকায় ওদের চোখে সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠেছে সে। ভয়ের একটা শীতল অনুভূতি শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। ঢোক গিলে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল, ইন্সপেক্টর ধীর পায়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার।

'আপনি…জুবের আলম?' টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ইন্স-পেক্টর।

মুখ তুলল জুবের। যতটা সম্ভব নির্লিপ্তভাবে বলল, 'বলুন।'

'আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'প্রশ্ন? আমাকে?' চোখের চারপাশের চামড়া কুঁচকে উঠে একটু একটু কাঁপছে।

'হ্যাঁ। আমার সাথে আসবেন একটু?' বলে পিছন ফিরল ইন্সপেক্টর, এগিয়ে গেল অফিস কামরার দিকে। পিছন ফিরে একবার তাকাবার প্রয়োজনও বোধ করল না।

পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকল জুবের। শিরদাঁড়ার পাশ ঘেঁষে সড় সড় করে ঘামের একটা ফোঁটা নেমে আসছে। কোথাও কোন ভুল করে ফেলেনি তো সে? ইন্সপেক্টর এমন কোন সূত্র খুঁজে পায়নি তো যা দেখে তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে? উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল জুবেরের, চোখের সামনে ভেসে উঠল জিনেতের ফর্সা মুখটা।

টলতে টলতে এগোল সে। ইন্সপেক্টর কি তাকে গ্রেফতার করার জন্যে অফিস কামরায় ডেকেছে? তার কি পালানো উচিত? হাঁটার গতি কমিয়ে আনল সে। এখনও সময় আছে, জুবের। পালাও।—মনের ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিল তাকে। কিন্তু নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল সে—কোথাও কোন ভুল হয় নি, কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই। এখন পালাতে চেষ্টা করলে ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে যে সে ই খুনী। তাছাড়া, এই ধরনের উত্তেজনাকর একটা পরিস্থিতিই তো চাইছিল সে। দেখাই যাক না, কিভাবে ওরা তাকে খুনী বলে প্রমাণ করে।

অফিস রুমে ঢুকল জুবের। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ওর মুখে স্থির হয়ে আছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সাত

কক্সবাজারে এলেই প্লাজা হোটেলে ওঠে শফিকুর রহমান বাবু। কারণ হল, প্লাজায় উঠলে বিনা খরচে খাওয়া এবং থাকা যায়। শুধু তাই নয়, ডার্ক-রুম হিসেবে প্লাজার একটা বাথরুমকে ব্যবহার করতে পারে সে। হোটেলটার মালিক একজন মহিলা, নাম আইরিন পারভিন। লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান সে, ওজন তিন মনের কাছাকাছি। মহিলা সম্পর্কে ছোট্ট কিন্তু তিক্ত একটা অভিজ্ঞতা আছে শফিকের।

বছর দশেক আগে ঢাকার এফ. ডি. সি.-তে পরিচয় হয়েছিল

তার আইরিন পারভিনের সাথে। ছায়াছবিতে অভিনয় করার একটা সুযোগের সন্ধানে ছিল পারভিন। সিনে জার্ণালিস্ট এবং ফটোগ্রাফার হিসেবেই তার সাথে পরিচয়, এবং সেই সূত্রেই পারভিনের ছবি তোলা। কিছুদিন আগে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় শফিকের মানসিক অবস্থা তখন এমন যে সহানুভূতিশীলা কোন নারীর সান্নিধ্য পেলে তাকে আঁকড়ে রাখার একটা ব্যাকুল ইচ্ছে পেয়ে বসত। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির মেয়ে পারভিন, পুরুষের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে তাকে খেলাতে ভালবাসত সে। অভিনেত্রী হবার মতো চেহারা থাকলেও, ধৈর্য বা শেখার আগ্রহ তার ছিল না। শফিকের ব্যাংক ব্যালেন্স তখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাকে ফতুর করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভালবাসার অভিনয় শুরু করে সে। শফিকের তখন যা মানসিক অবস্থা, তাকে গেঁথে ফেলতে কোন অসুবিধেই হনি পারভিনের।

পরিচয় হবার মাস দুই পর শফিকের সাথে কক্সবাজারে বেড়াতে এল পারভিন। এই হোটেল প্লাজাতেই উঠেছিল ওরা। হোটেল মালিক বৃদ্ধ মনসুর আলি হার্টের রোগী ছিল। লোকটা ছিল নিঃসন্তান, স্ত্রী মারা গিয়েছিল বিশ বছর আগে। এই হোটেল এবং অন্যান্য সম্পত্তির লোভে পারভিন শফিককে ছেড়ে সেই বুড়োকে নিয়ে মেতে উঠল। সাত দিন পর ঢাকায় ফিরে গেল শফিক—একা। মনসুর আলি আর পারভিনের বিয়েতে উপস্থিত থাকার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। বিয়েটা পরদিনই সম্পন্ন হয়।

বছর খানেক পর, পারভিনের হিসেবকে সঠিক প্রমাণিত করে, হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় মনসুর আলি। রাতারাতি এই হোটেল, কয়েক লক্ষ নগদ টাকা এবং বেশ কিছু জমিজমার মালিক হয়ে যায় পারভিন। কিন্তু এত কিছু পেয়েও তার উচ্চাশা মেটেনি।

আর কেউ জানুক বা না জানুক, শফিক জানে, চোরাচালানীদের সাথে গভীর একটা সম্পর্ক আছে পারভিনের। অবৈধ উপায়ে বেশ মোটা টাকাই রোজগার করে সে।

স্বামীর মৃত্যুর পর চিঠি লিখে শফিককে কক্সবাজারে ডেকে পাঠায় পারভিন। ইতিমধ্যে আঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে শফিক, কৌতূহল বশতই তার ডাকে সাড়া দেয় সে। সেই থেকে মোটামুটি একটা সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'জনের মধ্যে। কক্সবাজারে এলে শফিক এই প্রাসাদেই ওঠে। পারভিনের মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মধ্যে তার বিছানায় শোবার অধিকার পায় সে।

সকাল। সাড়ে ন'টা। কাল রেনবোতে তোলা ছবিগুলো একটা পানি ভর্তি গামলায় রেখে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছে শফিক। তিনটে ফটো। একটায় দেখা যাচ্ছে, সাতাশ নম্বর স্যুইটের দরজার তালা খুলছে জুবের আলম। পরেরটায় দেখা যাচ্ছে, ওই একই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করছে ইফফাৎ সানিয়া। শেষ ছবিটা জেসমিন আলমের—দরজার হাতলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, কপালে বিরক্তির রেখা। সবগুলো ফটোতেই ওয়াল ক্লকটা দেখা যাচ্ছে। চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে দরজার সামনে এসেছে জুবের আলম। ঠিক চারটের সময় এসেছে সানিয়া। চারটে বেজে সাড়ে সাত মিনিটের সময় দরজায় দেখা যাচ্ছে জেসমিন আলমকে।

আপন মনে হাসল শফিক। ছবিগুলো সরকারী উকিলের হাতে পড়লে জুবের আলমের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে সে। শুধু কি তাই! টি আলমের সুন্দরী বউটাকেও হত্যাকাণ্ডে সহায়তার জন্যে ফাঁসাতে কোন অসুবিধে হবে না তার। পানি ফেলে দিয়ে গামলায় নতুন করে পানি ভরল সে। সিগারেট ধরাল। ঠিক এই সময় নক হল

দরজায়। কেন যেন, ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠল সে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকল ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড। আবার নক। দরজা খুলে কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পারভিন, চেহারাটা আশ্চর্য কঠিন। কবাট দুটো পুরোপুরি খুলে দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'তু-তুমি?'

'এমন চোরের মতো করছ কেন?' দু'কোমরে হাত রেখে ঘরে ঢুকল পারভিন। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে শফিক। পারভিনকে সাংঘাতিক ভয় করে সে। বাথরুমের মাঝখানে দাঁড়াল পারভিন। 'কি করছিলে তুমি?' চোখে সন্দেহ, ভঙ্গিটা মারমুখো। 'আমাকে দেখে এমন ভয় পেলে কেন?'

'না···মানে, ভয় পাব কেন।' জোর করে হাসতে চেষ্টা করল শফিক। '···ভয় পাবার কি আছে।'

'ভয় পাবার কি আছে।' প্রকাণ্ড মুখটা বিকৃত করে তুলে ভেঙচে দিল পারভিন 'ভয় পাবার কিছুই যদি না থাকে, তাহলে পুলিশ কেন খুঁজছে তোমাকে?'

'পুলিশ?' দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল শফিক, যেন লুকাবার একটা জায়গা খুঁজছে। 'কি বললে। পুলিশ।'

'চোপ।' পারভিনের কর্কশ গলা থেকে হুংকার বেরিয়ে এল। নিজে পুলিশকে ভয় পায় না বলে অন্য কেউ পুলিশকে ভয় পেলে তাকে ঘৃণা করে সে। 'অমন ঠক ঠক করে কাঁপতে হবে না। ওদেরকে আমি বলে দিয়েছি, তুমি এখানে নেই। গতরাতে নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল করে এসেছ, তাই না? ফিরেছ তো শেষ রাতে, কোথায় ছিলে শুনি?'

বিমূঢ় চেহারা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল শফিক। কি বলবে

ভেবে পেল না। নিজের বিপদটা কোথায় তা যেন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করতে পারল সে। বুঝতে পারল, হোটেল রেনবোর সিকিউরিটি গার্ড সাঈদই পুলিশকে জানিয়েছে মেয়েটা খুন হবার সময় তিন তালার করিডোরে তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে সে। হোটেল থেকে বেরোবার সময় আরো একজন দেখে থাকতে পারে তাকে। রিশেপসনে বসা কেরাণী। তথ্যটা পুলিশকে নিশ্চয় জানাবে সে। বুকের ভেতর চিন চিনে একটা ব্যথা অনুভব করল শফিক। মনে পড়ে গেল, সাবধানে চলাফেরা করতে বলে দিয়েছে ডাক্তার, তার হার্টের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। পুলিশ কি ধরে নিয়েছে সে-ই খুন করেছে সানিয়াকে? পুলিশরা যা বোকা, এই রকম কিছু একটা ভেবে নেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

'যা ভেবেছি!' শফিকের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে উঠতে দেখে সবজান্তার মতো প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়ল পারভিন। 'ঠিক একটা গোলমাল বাধিয়ে বসে আছে।' শফিকের কাঁধ ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল সে। 'অ্যাই! কি হয়েছে সব বল আমাকে। জলদি। ভাল করেই জান, এসব ঝামেলা থেকে একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি। জলদি! জলদি! কি হয়েছে?'

হঠাৎ পারভিনের একটা হাত চেপে ধরল শফিক। 'খোদার কসম বলছি, পারভিন! আমি কিছু করিনি। বিশ্বাস কর...'

অলস ভঙ্গিতে শফিকের কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে নিল পারভিন। 'তোমার মতো মেয়েমানুষকে সাহায্য করতে বয়েই গেছে আমার। যাই, পুলিশকে ফোন করে বলি, তুমি এখানেই আছ।' ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে।

'না-না!' আঁতকে উঠল শফিক। ভাবল, ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া অত্যন্ত কড়া এবং বুদ্ধিমান লোক, চেপে ধরলে তাকে হয়ত সত্যি

কথাগুলো বলে ফেলতে হবে। সত্যি কথা বললে টি আলমের কাছ থেকে টাকা আদায়ের আশাটা ছেড়ে দিতে হবে। আর মিথ্যে বললে হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করার দায়ে পড়তে হবে। তারচেয়ে পুলিশকে কিছু দিন এড়িয়ে চলাই সবদিক থেকে ভাল। পুলিশ তাকে জেরা করার আগেই টি আলমের সাথে বোঝাপড়াটা হয়ে যাওয়া দরকার। টাকা পেলে পুলিশকে মিথ্যে বলার ঝুঁকিটা নেয়া যেতে পারে। বিশ লাখ টাকার জন্যে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়া বোকামি নয়। কিন্তু পারভিনের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা এখন আর সম্ভব নয়। একবার যখন সন্দেহ হয়েছে তার, সমস্ত ব্যাপার না জেনে ছাড়বে না সে। এবং কোন সন্দেহ নেই, টাকার ওপরও মস্ত একটা ভাগ বসাবে সে। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সে। পারভিনকে সব কথা বলাই ভাল। এসব ব্যাপারে তার চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেক বেশি। সব দিক সামলাতে হলে পারভিনের সাহায্য তার দরকার।

গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল পারভিন। উত্তেজনায় শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে গেল তার। শফিকের কথার মাঝখানে এক চুল নড়ল না সে, একটু শব্দও করল না। শফিক থামতে তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছবিগুলো দেখি।'

কয়েক মিনিট পর ছবিগুলো শফিকের হাত থেকে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল পারভিন। তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'এগুলো আসলে কি, জান?'

'কি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল শফিক।

'সোনার খনি!'

এই প্রথম হাসি ফুটল শফিকের মুখে। 'টি আলমের কাছ থেকে নেগেটিভগুলোর বদলে বিশ লাখ টাকা চাইব বলে ভেবেছি—তুমি

কি বল ?'

'টি আলমের কাছ থেকে চাইবে ? তাও বিশ লাখ টাকা ?' খিল খিল করে হেসে উঠল পারভিন।

'হাসছ যে।'

'টি আলমের চেহারা দেখে কি তাকে অত ভীতু বলে মনে হয় তোমার, শফিক ?' বলল পারভিন। 'ওর মতো চেহারা যাদের, তারা কখনও হুমকির কাছে মাথা নত করে না। উঁহু, তুমি ভুল করতে যাচ্ছ, শফিক। ওর কাছে গেলে নির্ঘাৎ পুলিশ ডাকবে সে।... না। আমরা আসলে একজনের কাছেই যেতে পারি—আর সে হল, জেসমিন।' শফিক কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত নেড়ে তাকে বাধা দিল সে। 'জেসমিন আলম সম্পর্কে কিছু জান তুমি ? জান না। আমি জানি। সাত ঘাটের পানি খাওয়া মেয়ে। বড় কষ্ট করেছে বেচারী প্রথম জীবনে। জীবনে কখনও ভাবতেও পারেনি এই রকম একজন কোটিপতি স্বামী পাবে, সমাজের এই রকম একটা উঁচু জায়গায় উঠতে পারবে। এখন, এসব যদি হারাবার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়, নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে সে। এবং আমরা চাই-ও ঠিক তাই। পারিবারিক সম্মান, স্বামীর মর্যাদা, নিজের নিরাপত্তা ইত্যাদি রক্ষার জন্যে বিশ লাখ টাকা দিতে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। টাকা চাইতে হলে ওই জেসমিনের কাছেই চাইতে হবে।'

কথাগুলো মনে ধরল শফিকের। 'কিন্তু অত টাকা পাবে কোথায় জেসমিন ?'

'কোন ব্যাপারেই তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। নগদ টাকা জেসমিনের কাছে বেশি না থাকারই কথা। কিন্তু গহনা ? আমার হিসেবে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ

লাখ টাকার বেশি হবে। হীরে বসানো যে জড়োয়া সেটটা পরে কক্স-বাজারে এসেছে সেটার দামই তো কমপক্ষে বিশ লাখ টাকা। প্রথম বার সেটাই চাইব। তারপর চিন্তা করে ঠিক করা যাবে আর কি কি চাওয়া যায়। বলেছি তো, এটা একটা সোনার খনি।'

হতভম্ব দেখাল শফিককে। 'তার মানে ···বারবার চাইবে বলে ভাবছ নাকি? না··· সেটা উচিত হবে না, পারভিন। একবারে যা পাওয়া যায় আদায় করে নিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল···'

'বলেছি তো এসব ব্যাপারে তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।' কড়া ধমকের সুরে বলল পারভিন।

ভয়ে চুপ করে থাকল শফিক। পারভিন রেগে উঠলে বুকের ব্যথাটা বেড়ে যায় তার।

'শোন, হোটেল থেকে তোমার বেরুনো চলবে না। যতক্ষণ না জেসমিনের সাথে একটা রফায় আসছি ততক্ষণ নিজের ঘরে বন্দী করে রাখ নিজেকে। তারপর···আমার বন্ধুর একটা হোটেল আছে রামুতে, সেখানে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। রামুতে থাকলে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করাটা সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্যে। বলতে পারবে, কক্সবাজারে ছিলে না, তাই তারা তোমাকে খুঁজে পায়নি।'

'কিন্তু···'

'কোন কিন্তু নয়!' আবার চোখ রাঙাল পারভিন। 'তোমার জন্যে এটা একটা মস্ত সুযোগ, আমি চাই না বোকার মতো সেটা তুমি নষ্ট কর। জেসমিনের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা হয়ে গেলে পুলিশের কাছে যেতে পারবে তুমি। চমৎকার একটা গল্প বানিয়ে বলবে ওদেরকে। গল্পটা সময় মতো বানিয়ে দেব আমি···'

'কিন্তু পারভিন, একটা কথা ভেবে দেখছ?' মরিয়া হয়ে বলল শফিক। 'আমি যে তাহলে একটা মার্ডারে সহায়তা করার দায়ে পড়ব।'

'পুলিশ যদি সত্যি ব্যাপারটা ধরতে পারে, তবে—তাই না?' মুচকি একটু হাসল পারভিন। 'এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।' পরমুহূর্তে চেহারাটা আবার কঠিন হয়ে উঠল তার। 'যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও। জেসমিনকে আমি এখুনি ফোন করতে চাই।'

'কিন্তু...'

'ফের কিন্তু?'

'না...মানে...'

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল পারভিন। 'বেরোও!'

নিজের ঘরে চলে এল শফিক। দশ মিনিট পর ভেতরে ঢুকল পারভিন। মুখটা উদ্ভাসিত, আত্মবিশ্বাসের হাসি উপচে পড়ছে।

'বলিনি তোমাকে? বলিনি, টাকা ওই জেসমিনের কাছ থেকেই আদায় করা সম্ভব?' মস্ত থাবা দিয়ে শফিকের কাঁধ চাপড়ে দিল পারভিন। 'এখানে আসছে জেসমিন। বলল, সামনাসামনি বসে আলাপ করতে চায়। ভালই হল। এখানে বসে আলাপ করলে ওকে ভয় দেখানো সহজ হবে।'

ব্যাপারটা তেমন ভাল ঠেকল না শফিকের। এখন মনে হচ্ছে, পারভিনকে এসবের মধ্যে না টানলেই ভাল হত। কিন্তু মুখে বলল, 'ঠিক আছে। যা ভাল বোঝো কর।'

শফিকের কাছ থেকে ভিজে ছবিগুলো চেয়ে নিল পারভিন। সেগুলো ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া বলল,

'বসুন।' ছেলেটার বয়স খুব কম, দেখতেও সুন্দর, ভাবল সে। দেখে মনে হচ্ছে খুব ঘাবড়ে গেছে। এ-ও এক ধরনের ফোবিয়া, পুলিশ দেখলেই ভয় পায় লোকে।

সিগারেট ধরাল ইন্সপেক্টর। তারপর সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। 'আজ সকালে এই হোটেলে, লিফটের ভেতর একটা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। শুনেছেন?'

'লাশ পাওয়া গেছে? কই, না তো।'

'এটা একটা খুন। আমার হাতে যেসব প্রমাণ আছে তা থেকে জানি শেষ বার মেয়েটিকে যাঁরা দেখেছেন আপনি তাদের মধ্যে একজন।'

'কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলল জুবের। 'খুন? কে…সে?'

'ইফফাৎ সানিয়া। কাল বিকেল সাড়ে তিনটার সময় তার সাথে আপনার কথা হয়, তাই না?'

'ইফফাৎ সানিয়া। সে কি, তিনি খুন হবেন কেন। কোথায়… মানে, কেন? কে?'

'হ্যাঁ—কে? এখনও জানি না কে, তবে জানতে পারব। জানতে চাইছিলাম তার সাথে আপনি কথা বলেছিলেন কিনা?

'হ্যাঁ…বলেছিলাম। কয়েকজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলছিল ওর, তখন আমিও ছিলাম ওখানে। ওর সম্পর্কে বাবার আগ্রহ আছে, তাই আমিই যেচে পড়ে দু'একটা কথা বলি।' কে দেখেছে ওদেরকে কথা বলতে? পুলিশকে ব্যাপারটা জানাল কে? 'ঠিক কি বলেছিলাম এখন তা আর আমার মনে নেই। মামুলি আলাপ, তার বেশি কিছু নয়।'

'সৈকত থেকে চলে যাবার সময় বলেননি, কোথায় যাচ্ছেন তিনি?'

'বলেননি, আমি জানতেও চাইনি.' বলল জুবের।'...এখন মনে পড়ছে, তাঁকে আমি বলেছিলাম, বাবা তাঁকে সুযোগ দিলে তিনি সেটা নেবেন কিনা। এই ধরনেরই কথাবার্তা হয়েছিল।'

ঠক ঠক করে টেবিলে পেন্সিল ঠুকল ইন্সপেক্টর। 'চারটের দিকে হোটেলে ফিরে আসেন আপনি, ঠিক কিনা?'

'হ্যা—সাঁতারের পোশাক নেবার জন্যে ফিরে এসেছিলাম।'

'সানিয়া আপনার বাবার সাথে দেখা করতে আসেননি?'

ছ্যাৎ করে উঠল জুবেরের বুক। 'বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। কি করে। বাবা তো তখন সিনেমায়।'

'এমনও তো হতে পারে যে কথাটা সানিয়া জানতেন না?'

'কিন্তু সে-রকম কোন ইচ্ছে থাকলে আমাকে অন্ততঃ বলতেন, তাই না?'

পেন্সিলটা টেবিলে রেখে দিয়ে জুবেরের চোখে সরাসরি তাকাল ইন্সপেক্টর।'এই ব্যাপারটার ওপর বেশি করে জোর দিচ্ছি এই কারণে যে, আমরা প্রায় নিঃসন্দেহে জানি, সানিয়া তিন তালায় কারো সাথে দেখা করার জন্যেই এই হোটেলে এসেছিলেন। আপনি যখন তিন তালায় উঠছিলেন, ওকে দেখেননি তো? মনে করে দেখুন।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল জুবের। জানল কি-ভাবে, সানিয়া তিন তালাতেই এসেছিল? স্যুইটের দরজায় কেউ তাকে টোকা দিতে দেখে ফেলেছে? গলাটা স্বাভাবিক রাখার যথা-সাধ্য চেষ্টা করে বলল, 'না। দেখলে আগেই বলতাম আপনাকে।'

'তা ঠিক। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন...তিন তালায় ওঠার সময় সানিয়াকে দেখেননি। নিজেদের স্যুইটে ঢুকে সাঁতারের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে আসেন আবার—এই তো?'

ফাঁদটা পরিষ্কার দেখতে পেল জুবের। যতটুকু ভাব দেখাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি কিছু জানে লোকটা। সতর্ক হয়ে উঠল সে। বলল, 'ঠিক তা নয়। বেরুতে যাচ্ছি, এই সময় আমার মা ফিরে আসেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি আমি। তিনিও সাঁতারের পোশাক নেবার জন্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে একজনকে একটা চিঠি লেখার কথা মনে পড়ে যায় আমার, তিনি আবার চলে যাবার খানিক পর চিঠি লেখা শেষ করে আমিও বেরিয়ে আসি।'

'হুঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল ইন্সপেক্টর। 'তার মানে, আপনি বলছেন, সৈকতে সানিয়ার সাথে কথা বলার পর তার সাথে আপনার আর দেখা হয়নি?'

'ঠিক তাই বলছি।'

'কিন্তু করিডোর ধরে স্যুইটে যাবার সময় আর কাউকে দেখেছিলেন কি?'

'আর কাউকে? না তো!'

'ক্যামেরা কাঁধে একজন লোক, করিডোরে ঘুর ঘুর করছিল— দেখেননি?'

'ক্যামেরা কাঁধে?' আড়ষ্ট হয়ে উঠল জুবের। 'না! কেউ ছিল নাকি?'

'ছিল। শুধু যে ছিল তাই নয়, হোটেলের সিকিউরিটি গার্ড তাকে আপনাদের স্যুইটের দরজায় আড়ি পাততেও দেখেছে। সিনে-জার্নালিস্ট, শফিকুর রহমান। তাকে আমরা খুঁজছি।'

মনে পড়ে গেল জুবেরের। বাবার সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল শফিকুর রহমান। কথাটা ইন্সপেক্টরকে বলল সে।

'তার মানে, আপনাদের দরজায় টোকা দেবার মতো একটা কারণ ছিল তার।' একটু নিরাশ দেখাল ইন্সপেক্টরকে।

'বাবার দেখা পাবার জন্যে লোকটা একেবারে অস্থির হয়ে ছিল, এটুকু আমি বলতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। 'আপনার সময় নষ্ট করলাম বলে আমি দুঃখিত, মিঃ জুবের। আশা করি...'

'না-না, সে কি। দুঃখিত হবার কি আছে। আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারলাম না বলে আমারই খারাপ লাগছে।'

'সাহয্য যে একেবারে করেননি, তা নয়,' বলল ইন্সপেক্টর। 'ভাল কথা, সানিয়া একটা পুঁতির হার পরেছিলেন। ওটার বর্ণনা দিতে পারবেন?' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখছে সে।

'অবশ্যই পারব,' ফস করে বলে ফেলল জুবের। 'নীলকান্ত মণির মতো দেখতে পুঁতিগুলো...' হঠাৎ নিজের ভুলটা ধরতে পেরে থেমে গেল সে। সর্বনাশ। সৈকতে সানিয়ার গলায় পুঁতির হারটা দেখে-নি সে। দেখেছিল সে যখন সেটা পরে ওদের স্যুইটে আসে।

এতক্ষণে মুখ তুলল ইন্সপেক্টর। 'ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা যাক। ঠিক আছে, মিঃ জুবের, আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

অফিস কামরা থেকে বেরিয়েছে জুবের, এই সময় চাপা গলায় কে যেন ডাকল, জুবের।' চমকে উঠে দরজার দিকে ফিরল সে। দেখল, হন্তদন্ত হয়ে লবিতে ঢুকছে জেসমিন। পরনে নীল শাড়ি, কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই জেসমিনের। সামনে এসে দাঁড়াল সে। ফিসফিস করে বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস কর না। আমার সাথে এস।' বলে আর দাঁড়াল না, আধপাক ঘুরে হন হন করে আবার এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

দ্রুত হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল সে। বুঝতে অসুবিধে হল না, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। ভয়ে ভয়ে তাকে অনুসরণ করল জুবের।

সৈকতে এসে নির্জন একটা জায়গায় বালির ওপর বসল ওরা। 'বাবা কি…?'

'ঘুমাচ্ছে' ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে জেসমিন। কপালে চিক চিক করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'একটা মেয়েলোক টেলিফোন করেছিল। আমার সাথে দেখা করতে চায়। একটা হোটেলের ঠিকানা দিয়েছে। সানিয়াকে যে তুমি খুন করেছ. এই মেয়েলোকটা তা জানে।'

স্থির পাথরের মতো বসে থাকল জুবের। 'কি বলছ। অসম্ভব!' নিজের কানেই বিকৃত শোনাল নিজ গলার আওয়াজ। 'কিভাবে জানবে. কে…?'

'নাম বলল সাইরিন পারভিন, হোটেল প্লাজার মালিক। বলল, কাল রেনবোয় যা ঘটেছে তার ফটো তোলা হয়েছে। সেগুলো তার কাছেই আছে। আমাকে দেখাতে পারলে খুশি হবে। যদি দেখতে চাই, এক ঘণ্টার মধ্যে প্লাজায় যেতে হবে আমাকে। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয়নি. তার আগেইরিসিভার রেখে দেয়।'

ভয়ে কুঁকড়ে গেল জুবের। 'ফটো?' একটা ঢোক গিলল সে। 'কিসের ফটো?'

'আস্তে কথা বল। কিসের ফটো তা আমি কি করে জানব? লাশটা লিফটে নিয়ে যাবার সময় আড়াল থেকে কেউ তোমার ফটো তোলেনি তো?'

'অসম্ভব। আলো এত কম ছিল ওখানে যে ফ্ল্যাশ ছাড়া ফটো উঠতেই পারে না…' হঠাৎ চমকে উঠে থেমে গেল জুবের। ইন্সপেক্ট-

রের কথা মনে পড়ে গেছে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে সিনে-জার্ণালিস্ট শফিকুর রহমান বাবুকে করিডোরে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে, ওদের স্যুইটের দরজায় আড়িও পেতেছিল লোকটা। 'দাঁড়াও, ভাবতে দাও আমাকে।' রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল জুবের। 'পুলিশের মুখ থেকে শুনলাম, একজন সিনে জার্ণালিস্টকে ওপরে দেখা গেছে কাল বিকেলে...'

'পুলিশ।' আঁতকে উঠল জেসমিন। 'পুলিশ তোমার সাথে কথা বলেছে নাকি?'

'আমি যে সৈকতে সানিয়ার সাথে কথা বলেছিলাম তা কিভাবে যেন জানতে পেরেছে ওরা। আমি কোন তথ্য দিতে পারব ভেবে কয়েকটা প্রশ্ন করেছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'ভয় আমি পাচ্ছি, না তুমি?' তীব্র বিদ্রূপের সুরে বলল জেসমিন। 'চেয়েছিলে উত্তেজিত হতে, রোমাঞ্চিত হতে, কিন্তু এখন তোমার চেহারা এমন পাকানো শুকনো দড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে কেন?

অপমানটা হজম করল জুবের। 'মেয়েলোকটার সাথে কথা বলে দেখ তুমি। ফটোগুলো মারাত্মক কিছু নাও হতে পারে।'

হঠাৎ জুবেরের একটা হাত চেপে ধরল জেসমিন। 'এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা জুবের, আর দেরি করা কোনো মতেই উচিত হবে না। সব কথা জানানো দরকার তোমার বাবাকে। আমরা...'

'তার মানে আমার সর্বনাশ করার কথা ভাবছ তুমি?' ঠাণ্ডা চোখে জেসমিনের দিকে তাকাল জুবের। আবার সেই অর্থহীন হাসিটা

দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ, পুলিশ আমাকে ধরলে তোমাকেও ধরবে? অন্ততঃ যাতে ধরে তার ব্যবস্থা আমি করব? তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না, তোমাকে না নিয়েই ডুবব আমি? ভুলে যেয়ো না, বাবার কানে এসব গেলেই তিনি পুলিশ ডাকবেন।'

'পুলিশ ডাকতে চাইবে, তা ঠিক,' নিচু গলায় বলল জেসমিন। 'কিন্তু আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব...'

'তাতে কাজ হবে না,' গম্ভীর হয়ে উঠল জুবেরের চেহারা। 'তারচেয়ে, আগে দেখই না কি আছে ফটোগুলোয়। নেগেটিভ-গুলোর বিনিময়ে কত চায় সেটাও শোনো। পরিস্থিতিটা আগে বুঝি, তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'ঘুম থেকে উঠে তোমার বাবা খুঁজবে আমাকে, তাকে বলো, আমি সাঁতার কাটতে এসেছি। চললাম।'

চলে গেল জেসমিন। ভাঁজ করা হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে থাকল জুবের। ফটোগুলো নিশ্চয়ই মারাত্মক। তা না হলে সেগুলো দেখাবার আগ্রহ হত না আইরিন পারভিনের। যাই হোক, প্রথমে ফটো আর নেগেটিভগুলো আদায় করে নিতে হবে। তারপর এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে মেয়েলোকটা যেন আর কখনও তাকে বিরক্ত করতে না পারে। আর ওই শালা শফিক...কোথায় আছে সে? পুলিশের ধারণা, ওই ব্যাটাই খুন করেছে সানিয়াকে। ঠিক তাই! আপন মনে হাসল জুবের। বেশ চমৎকার পরিস্থিতি। হয়ত এই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগালে এ-থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটা উপায় বেরিয়ে যাবে। তার মানে, পুলিশকে আরো ভাল ভাবে বোঝাতে হবে যে এই শফিকই সানিয়াকে খুন করেছে।

ব্যাপারটা নিয়ে আরো চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

উঠে দাঁড়াল জুবের। হোটেলের দিকে ফিরে আসছে। সাড়ে দশটার মতো বাজে। রেনবোর লবিতে ঢুকেই বাবাকে দেখতে পেল সে। ম্যানেজার মুকুল হককে সাথে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তিনি। ছেলেকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। আপন মনে কি যেন বললেন। কে জানে, সম্ভবতঃ অভিশাপ দিল, ভাবল জুবের। বাপের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'সাঁতার কাটতে গেছে জেসমিন' বলল জুবের। 'ফিরতে এক ঘণ্টার মতো দেরি হবে।'

'রামুতে যাচ্ছি আমি, ছোট্ট একটা শুটিং আছে ওখানে,' বললেন টি আলম। 'জেসমিন যদি চায়, যেতে পারে। লোকেশনটা কোথায় জানা আছে তার। তুমিও যেতে চাও নাকি?'

'না···মানে···আমার একটা প্রোগ্রাম আছে ··'

'সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার প্রোগ্রাম তো?' গজ গজ করতে করতে এগিয়ে গেলেন টি আলম।

স্যুইটে ফিরে এল জুবের। বাবার প্রতি অদ্ভুত একটা ঘৃণা অনুভব করল সে। লাউঞ্জে বসে সিগারেট ধরাল। মিনেতের কথা মনে পড়ল। কি করছে এখন সে। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসে। কিন্তু এই মানসিক উত্তেজনা নিয়ে এখন তার সাথে দেখা করা উচিত হবে না। জেসমিন যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে।

আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিরল জেসমিন। দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে। রক্তশূন্য মুখটা বিশ্রী হয়েছে দেখতে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ভয় নয়, আশ্চর্য একটা ঘৃণা

ফুটে রয়েছে। হঠাৎ সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল জুবের। বুঝতে পারল, জেসমিনকে বোধহয় আর বিশ্বাস করা উচিত হবে না। বেঈমানী করার কথা ভাবছে ও।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুবের। 'বাবা রামুতে গেছেন। কি বলল পারভিন? ফটোগুলো এনেছ?'

ধীর পায়ে এগিয়ে এল জেসমিন। হাতব্যাগ খুলে নোংরা একটা এনভেলাপ বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের দিকে এনভেলাপটা তুলে নিয়ে ফটো তিনটে দেখল জুবের। তারপর আবার এনভেলাপে ভরে টেবিলের ওপর রেখে দিল। আরো মারাত্মক ধরনের ফটো আশা করছিল ও। দেয়াল-ঘড়িটাই শুধু সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। তবে, দেয়াল ঘড়ির সময় দেখে প্রমাণ করা যায় না যেসেই সানিয়াকে খুন করেছে।

'খুব একটা বিপজ্জনক কিছু নয়,' বলল সে। 'কি বল? ফটো-গুলো থেকে শুধু জানা যাচ্ছে খুন হবার কিছু আগে সানিয়া আমা-দের সাথে এই স্যুইটে ছিল। মেয়েলোকটা কি বলল?'

প্লাজার রিশেপসনে জেসমিনের জন্যে অপেক্ষা করছিল আইরিন পার-ভিন। তাকে দেখেই প্রকাণ্ড মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল। 'আসুন, আসুন মিসেস আলম। আপনার জন্যেই বসে আছি আমি…'

'আমাকে কিছু দেখাবার আছে আপনার?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল জেসমিন।

'নেই মানে? নিশ্চয় আছে!' হাসির দমকে পারভিনের শরীরের ঝুলে পড়া চর্বির স্তরগুলো কাঁপতে শুরু করল। একটা দরজার দিকে

এগোল সে। 'আসুন, আসুন।' ভেতরে ঢুকল ওরা, দরজাটা বন্ধ করে দিল পারভিন। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন। কিছু খাবেন? চা? কফি? কিংবা ঠাণ্ডা কিছু?'

ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল জেসমিন। পারভিন একটা টেবিলে কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

'ফটোগুলো দেখান,' বলল জেসমিন।

ঠোঁট বাঁকা করে অসহায় একটা ভঙ্গি করল পারভিন। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা এনভেলাপ বের করে জেসমিনের সামনে রাখল। জেসমিনের বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, না জানি কি দেখবে ফটোতে। হাতের তালু ঘেমে গেছে তার। কিন্তু ফটো তিনটে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ভুল করল না সে। বুঝল, তিনটে ছবিতেই সাক্ষীর ভূমিকা পালন করছে দেয়াল ঘড়িটা। 'এগুলো কি বিক্রির জন্যে?' শান্ত গলায় জানতে চাইল সে।

'ঠিক ধরেছেন তো।' খিক খিক করে হাসল পারভিন। 'একজন লোক তুলেছে ফটোগুলো। সানিয়াকে আপনাদের স্যুইট থেকে বেরুতে দেখেনি বলে তার মনে সন্দেহ হয়। ভোর তিনটে পর্যন্ত আপনাদের স্যুইটের সামনে, করিডোরে ছিল সে। জুবের আলম সানিয়ার লাশ লিফটে রেখে আসে—তাও দেখেছে সে। সে যদি এই ফটোগুলো দেখিয়ে সাক্ষী দেয়, আপনাদের দু'জনেরই যাবজ্জীবন, এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। এসবই আপনি জানেন, তবু আপনাদের ভাল চাই বলে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়া আর কি।'

'কত?'

'পুলিশের কাছে এই ফটো এবং যা যা দেখেছে সব গোপন করে

গেলে আমার বন্ধু খুনের মতো ভয়ংকর একটা কাজে সাহায্য করার দায়ে পড়বে, তাই না? বুঝতেই পারছেন, প্রচুর টাকার বিনিময়েই শুধু এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হবে সে।'

'কত?' ফিসফিস করে আবার জানতে চাইল জেসমিন।

'কত? প্রথমবার, এই ধরুন, বিশ লাখ টাকা। বিশ লাখ খুব একটা বেশি টাকা নয় আপনাদের জন্যে...'

'প্রথমবার? তারপর আবার টাকা চাইবেন?'

'না-ও চাইতে পারি,' বিনয়ে একেবারে গলে পড়ল পারভিন। 'তবে, আমার বন্ধু যদি অভাবে পড়েন, হয়তো আবার কিছু দিতে হতে পারে আপনাকে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আদায় করার কোন ইচ্ছে আমার বন্ধুর নেই...'

'নেগেটিভগুলোর জন্যে কত চান?

খিক খিক করে আবার হাসল পারভিন। 'দুঃখিত। ওগুলো বিক্রি করার কোন ইচ্ছে আমার বন্ধুর নেই। ওই যে বললাম, কখনও যদি অভাব দেখা দেয়, তখন হয়ত তিনি আপনার কাছ থেকে আবার কিছু টাকা চাইতে পারেন। নেগেটিভগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে তো আর তা সম্ভব নয়।,

যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল জেসমিন, 'বিশলাখ...অত টাকা আমার কাছে নেই।'

'তা আমি বুঝতে পারি। স্বামী যত ধনীই হোক, স্ত্রীর হাতে অত টাকা দেয় না কেউ। কিন্তু আপনার সেই হীরে বসানো জড়োয়া সেটটা? ওটার দাম বোধ করি বিশ লাখের ওপরই হবে। তাই না?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল জেসমিন, তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'হ্যাঁ ওটা আপনাদেরকে দেয়া যেতে পারে।'

'আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে আর কি বলব আমি। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন, কাজেই সব রকম অভিজ্ঞতাই আপনার আছে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা, কেমন? সকাল ন'টা পর্যন্ত। এর মধ্যেই জড়োয়া সেটটা চাই। ন'টার পর আর অপেক্ষা করব না। পুলিশের কাছে সব জানিয়ে দেব। এই ব্যবস্থায় আপনি রাজি তো?

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল জেসমিন। এনভেলাপে ফটোগুলো ভরে জানতে চাইল, 'এগুলো নিয়ে যেতে পারি?'

ঠোঁট উল্টে বলল পারভিন, 'নিয়ে যান। আরো অনেক আছে আমাদের কাছে।'

১

প্রাজা হোটেলে ঠিক কি ঘটেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিল জেসমিন। সব শুনে চেহারাটা বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল জুবেরের।

'জড়োয়া সেটটা ওদেরকে দিলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে তা নয়,' বলল জেসমিন। 'আবার ওরা ব্ল্যাকমেইল করবে। এখন বলো, কি করবে?'

'এত ব্যস্ত হবার কি আছে,' চিন্তিত ভাবে বলল জুবের। 'কাল সকাল পর্যন্ত সময় তো পাচ্ছই।'

'কিন্তু ভেবে-চিন্তে একটা উপায় তো বের করে রাখতে হবে।'

হঠাৎ অদ্ভুত এক আচ্ছন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল জুবেরের চোখে। সেই অর্থহীন হাসিটা আবার দেখা গেল তার ঠোঁটে। মনে মনে শিউরে উঠল জেসমিন।

'জড়োয়া সেটটা ওদেরকে হয়ত দিতে হবে না, জেসমিন,' নিচু

গলায়, শান্তভাবে বলল জুবের। 'তার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে পারব আমি।'

'তার মানে? কি ব্যবস্থা করার কথা ভাবছ তুমি?'

সময় হলেই দেখতে পাবে,' বলল জুবের। 'শোন, ব্যাপারটা নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিয়ো না তো। যা করার আমিই করতে পারব,' জেসমিনের দিকে পিছন ফিরল সে।

'না!' প্রায় চিৎকার করে বলল জেসমিন। 'দাঁড়াও, জুবের! আমাকে বল। কি করতে চাইছ তুমি?'

'তা জেনে তোমার কোন দরকার নেই,' কথাটা বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল জুবের।

হঠাৎ লক্ষ্য করল জেসমিন, পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে তার। দাঁড়াতে পারল না, ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত।

আট

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সাগরের দিকে যাবার রাস্তাটার দু'পাশে সারি-সারি দোকান আর হোটেল-রেস্তোরাঁ। গিজ গিজ করছে লোক-জন, কেনাকাটায় ব্যস্ত সবাই। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ধীর পায়ে হাঁটছে জুবের। চাপা একটা উত্তেজনার ছাপ রয়েছে চেহারায়। জিনেতের কথা মনে পড়লেই পুলক অনুভব করছে সে।

গোল্ডেন ইনের সামনে দাঁড়াল জুবের। এই হোটেলেই বাবার সাথে উঠেছে জিনেত। সামনে একটা সুন্দর করে সাজানো রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে হোটেলে যাবার পথ। খানিক ইতস্ততঃ করে পিছন ফিরল জুবের, রাস্তার ওপারে তাকাল। রাস্তার ওপারে, একটু ডান দিক ঘেঁষে দোতালা প্লাজা হোটেল দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্লাজার সামনেও একটা রেস্তোরাঁ, ভেতর দিয়ে হোটেলে যাবার পথ। রাস্তার এপার থেকে রেস্তোরাঁর কাউন্টার পরিষ্কার দেখা গেল। কাউন্টারে একজন মেয়েলোক বসে রয়েছে, কথা বলছে পাশে বসা এক লোকের সাথে। মেয়ে তো নয়, চর্বি-মাংসের ডিপো বলে মনে হল জুবেরের। জেসমিনের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে, তার মানে, এই ধুমসী মেয়েলোকটাই আইরিন পারভিন। প্রায় মিনিট খানেক ধরে পারভিনকে দেখল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল গোল্ডেন ইনের রেস্তোরাঁর দিকে।

বেলা এগারোটা, অসময়ই বলা যায়, এই সময় রেস্তোরাঁয় জিনেতকে দেখবে বলে আশা করেনি জুবের। কিন্তু কোণের একটা টেবিলের দিকে চোখ পড়তে বুকের রক্ত ছলকে উঠল তার। জিনেতকে দেখে অদ্ভুত এক সুখদ শিহরণ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। রেস্তোরাঁয় ঢুকেই কিন্তু তার দিকে এগোল না সে। প্রথমে সতর্ক চোখে ভাল করে দেখে নিল জিনেতের আশপাশে কোন বিদেশী, অর্থাৎ তার বাবা আছেন কিনা। মাত্র তিনটে টেবিলে লোক রয়েছে, তারা কেউ বিদেশী নয়। ধীর পায়ে এগোল জুবের।

হঠাৎ মুখ তুলে জুবেরকে দেখতে পেয়েই উজ্জ্বল হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জিনেতের। তার চোখে আনন্দের দ্যুতি, মুক্তোর মতো সাদা দাঁত, চকচকে সোনালি চুল, দুধে আলতা রঙের নিখুঁত

অবয়ব দেখে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল জুবেরের। মুহূর্তের জন্যে নিজের ভাগ্যের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা হল তার। দুটো দিন আগে কেন পরিচয় হল না জিনেতের সাথে।

'কেন যেন মনে হচ্ছিল, তুমি আসতে পার,' সোনালি চুল নেড়ে বলল জিনেত। 'সেজন্যেই তো বসে আছি এখানে…' হঠাৎ কথার মাঝখানে ঘাড় ফিরিয়ে হোটেলে ঢোকার দরজার দিকে তাকাল সে। 'বাবার সাথে বেরুতে হবে এখুনি… আজ রাতে সৈকতে থাকবে তো? তখন গল্প করা যাবে…' জুবেরের চেহারাটা ম্লান হয়ে উঠল দেখে হেসে ফেলল সে, তার মানে, এখুনি চলে যেতে বলছি না। বাবা আসতে দু'চার মিনিট দেরি আছে এখনও। বসো।' জুবেরের একটা হাত ধরল সে, টেনে বসিয়ে দিল পাশের চেয়ারে।

বসল জুবের। সিগারেট ধরাল। অসহায় ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, 'আসলে·· স্বীকার করছি, তোমাকে দেখার লোভটা সামলাতে পারিনি বলেই চলে এলাম।'

'আমি কি এতই সুন্দরী?' মুখের চেহারা একটু লালচে হয়ে উঠল জিনেতের।

'হয়ত তোমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আছে, কিন্তু আমার শুধু তোমাকেই দেখতে ইচ্ছে করল…' হঠাৎ হেসে ফেলল জুবের। 'ভাব-ছিলাম, তোমাদের এই হোটেলে উঠে এলে মন্দ হয় না। দেখা করার খুব সুবিধে হয় তাতে।'

'কক্সবাজারে কি বেশ কিছুদিন আছ তুমি?'

'কর্মশালা শেষ হলেই রোমে যাবার কথা, বলিনি তোমাকে?' জিনেতের চেহারায় নিরাশার একটা ছায়া পড়তে দেখে খুশি হল জুবের। 'দুদিন পর গেলে বা একেবারে না গেলেও কিছু এসে যায়

না। সময় আসুক, তখন দেখা যাবে। রোমে না গিয়ে আমি হয়ত প্যারিসেও যেতে পারি।'

'তুমি কি সত্যি ভাবছ এই হোটেলে উঠে আসবে?'

'এক হোটেলে থাকলে দু'জন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করা যেতে পারে…'

রিস্টওয়াচ দেখল জিনেত।' বাবা তো ওয়র্কশপ নিয়েই যেতে আছেন, যখন খুশি আসতে পার তুমি আমাদের স্যুইটে। আমার কিন্তু ছবি-টবি দেখতে একটুও ভাল লাগে না। শোন, রাতে কিন্তু সেই জেটির কাছে থেক। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। তখন আলাপ করব কেমন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুবের। বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি জেটির কাছে গিয়ে বসে থাকি।'

হেসে ফেলল জিনেত। বিদায় নিয়ে গোল্ডেন ইনের রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল জুবের।

রাস্তা পেরিয়ে প্লাজার সামনে দিয়ে হাঁটছে ও। কিন্তু আইরিন পারভিনকে রেস্তোরাঁর কাউন্টারে দেখল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে সৈকতের দিকে অলসভঙ্গিতে এগোল, দু'পাশের মণিহারি দোকানগুলোর শো-কেসে সাজানো হরেক রকম টুকিটাকি জিনিসের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখতে পেল নীলকান্ত মণির মতো পুঁতির একটা হার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অবিকল এই রকম একটা হার পরেছিল সানিয়া। চট্ করে মাথায় একটা বুদ্ধি ঢুকল। দোকানে ঢুকে সেলসম্যানকে পুঁতির হারটা দেখিয়ে বলল, 'ওই পুঁতির হারটা দিন।' তারপর পকেটে হাত দিল মানিব্যাগ বের করার জন্যে। পুঁতির হারটা বের করে বাক্সে ভরতে যাচ্ছে

সেলসম্যান, ধাধা দিল জুবের। 'বাক্সে ভরার দরকার নেই।' লোক-টার হাত থেকে হারটা নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে ফেলল সে। 'ক্ষুর আছে আপনাদের এখানে?' মাথা ঝাঁকিয়ে সেলসম্যান জানাল, আছে। 'দিন একটা।' ক্ষুরটাও বাক্সে ভরতে নিষেধ করল জুবের। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। সেলসম্যান যে তার গমন পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তার।

অলসভঙ্গিতে আবার একবার প্লাজার সামনে দিয়ে হেঁটে এল জুবের। কাউন্টারে একটা লোক বসে রয়েছে। আইরিন পারভিনকে কোথাও দেখা গেল না। অন্ধকারে কাজ সারতে হবে ভাবল জুবের। রাত দশটার দিকে গোটা এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। তখন।

হার্টবিট বেড়ে গেল তার। রেনবো হোটেলের পথ ধরল সে।

ইতিমধ্যে বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়েছে ইফফাৎ সানির হত্যা-কাণ্ডের খবর। হোটেলের লবিতে গিজ গিজ করছে সাংবাদিকের দল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমদের অফিস কামরায় বন্দী হয়ে আছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। অব-শেষে একটা ছোটখাট বিবৃতি দিল সে। সাংবাদিকরা ব্যস্ত এবং উত্তেজিতভাবে ফিরে যেতে শুরু করল। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে যখন-যে খবর পাওয়া যায়, সাংবাদিকদের সব জানাবে বলে কথা দিয়েছে ইন্সপেক্টর। কিন্তু তার বিনিময়ে সাংবাদিকদের পূর্ণ সহ-যোগিতা চেয়েছে সে। কর্মশালা উপলক্ষে ক্ষুদে একটা বুলেটিন প্রকাশ হচ্ছে প্রতিদিন, তাতে হত্যাকাণ্ডের খবর ছাপার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে সে। তার ধারণা, খুনীকে সহজে ধরার জন্যে বুলেটিনের সাহায্য দরকার হতে পারে।

সাংবাদিকদের বিদায় করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল গোলাম কিবরিয়া। শফিকুর রহমান বাবু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছুই বলেনি সে। বলেছে, এখনও কাউকে বিশেষভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে না। অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওরা তাকে আর বিরক্ত করবে না। কিন্তু ওপর মহল থেকে, বিশেষ করে ওয়র্কশপের উদ্যোক্তা মহল থেকে তাড়াতাড়ি এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করার চাপ আসবে। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় কয়েকজন প্রযোজক, এফ. ডি. সি. অফিশিয়াল ফোন করে তাগাদা দিয়েছেন।

চোখ মেলে সহকারীর দিকে তাকাল গোলাম কিবরিয়া। দশাসই শরীরটা নেড়েচেড়ে সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। 'এখনও শফিক সাহেবের কোন খবর করা গেল না?'

'কক্সবাজারে কোন হোটেলে তিনি নেই,' বলল সনাতন। রামু ছাড়াও কাছে পিঠের দু'একটা জায়গায় লোক পাঠিয়েছি। দেখা যাক যাই বলুন, ভদ্রোলোকের এই হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া… আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।'

'সানিয়া খুন হবার সময়, এবং লাশটা যখন লিফটে তোলা হয়, তখন ভদ্রলোক এই হোটেলেই ছিলেন, টেবিলে পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে বলল ইন্সপেক্টর। '…সন্দেহ নেই, সে-ই আমাদের লোক। খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।'

'ধরা তিনি ঠিকই পড়বেন, একটু সময় লাগছে এই যা…'

টাইপ করা একটা তালিকার ওপর চোখ রাখল ইন্সপেক্টর। তিন তালার বোর্ডাদের তালিকা এটা। 'সানিয়া যখন এখানে আসে, মাত্র পাঁচটা স্যুইটে মানুষ ছিল। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি, সোজা ওপরে উঠে গিয়েছিল মেয়েটা—বোঝাই যায়, কোথায়, কার

কাছে যেতে চায় তা ভাল করেই জানত।'

'তিন তালায় তো সব নামী-দামী প্রযোজক এবং পরিচালকরা উঠেছেন, মেয়েটা হয়ত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে স্রেফ করিডোরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে এসেছিল…'

'তাহলে বলতে হয়, বোকার মতো একটা অসময় বেছে নিয়েছিল সে। তখন তো তিন তালা প্রায় ফাঁকা।' তালিকার দিকে আবার চোখ বুলাল গোলাম কিবরিয়া। 'এখানে বিখ্যাত পরিচালক কাজী আবদুল হানিফের নামও দেখছি—হয়ত হানিফ সাহেবের সাথেই দেখা করতে এসেছিল সানিয়া। কিন্তু হানিফ সাহেব তার স্যুইটে নেই দেখে ফিরে যাচ্ছিল সে, এই সময় তাকে দেখতে পায় শফিক…'

'এবং একা একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? কিন্তু, ইন্সপেক্টর সাহেব, ডাক্তার বলছেন, সানিয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়নি।'

'এমনও তো হতে পারে যে মেয়েটাকে খুন করার কোন ইচ্ছে ছিল না শফিক সাহেবের। কিন্তু ও মারা যেতে ভয় পেয়ে যায়…'

'কিন্তু পর্দার রশিটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সানিয়াকে কিন্তু গলা টিপে মারা হয়নি।' বলল সনাতন। 'এটা একটা পূর্ব-পরিকল্পিত খুন, ইন্সপেক্টর সাহেব।'

'ঠিক। সন্দেহ নেই, ফাঁকা একটা ঘরে সানিয়াকে ঢোকাতে হয়েছিল খুনীর। তাকে পর্দার রশি খুলতে দেখলে নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠত সানিয়া। রশির ফাঁস আগেই তৈরি করে রাখতে হয়েছিল খুনীকে। প্রশ্নটা তাহলে, এই খুনের মোটিভ কি?' হাতের পেন্সিলটা টেবিলের ওপর ঠক করে ফেলে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে, চোখ বুঁজে বলল, 'ওই শফিক সাহেবকে চাই আমি। তুমি ওপরে

যাও, সনাতন। তখন যে ঘরগুলো খালি ছিল সেগুলো এখনও খালি আছে কিনা দেখ। সবগুলো কামরা চেক করতে হবে আমাদের। হোটেল কর্তৃপক্ষ খুব মুশকিলে পড়েছেন—কাজেই বোর্ডারদের যাতে কোন রকম বিরক্ত করা না হয় সেদিকটাও দেখতে হবে তোমাকে।'

এই সময় বাইরে থেকে হোটেলের লবিতে এসে ঢুকল জুবের। বোর্ডারদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বুঝল, খবরটা এখন সবাই জানে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো রয়েছে হাত, বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে হারের সুতো ছিঁড়ে ফেলল। পকেটের ভেতর গড়িয়ে আলগা পুঁতিগুলো জড়ো হল এক জায়গায়। সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে থামল সে। কিন্তু দরজা খোলার কোন চেষ্টা না করে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল একটা। তারপর অন্যমনস্কতার ভান করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার।

সিঁড়ির মাথায় বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখে কঠোর দৃষ্টি, সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য তো হলই না, বরং আপন মনে একটু হাসল জুবের। ইন্সপেক্টর যে একজন প্রহরীর ব্যবস্থা করবে সে তো জানা কথা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে করিডোর ধরে আবার এগোল সে। থামল ত্রিশ নম্বর স্যুইটের সামনে। বিখ্যাত পরিচালক সাজেদুল হকের স্যুইট এটা। প্রথম দিকে ওয়র্কশপে হাজির ছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু শ্যুটিংয়ের জরুরী কাজে তাঁকে আবার ঢাকায় ফিরে যেতে হয়েছিল। দু'দিন ঢাকায় কাটিয়ে আজ সকালে তাঁর ফেরার কথা। এসবই ভাল করে জানা আছে জুবেরের। নক করল সে। জানে, কনস্টেবল লোকটা

তাকে লক্ষ্য করছে। হাতের তালু ঘেমে উঠল তার। সারা শরীরে আবার সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চ শিহরণ উপভোগ করছে সে।

দরজা খুলে উঁকি দিলেন পরিচালক সাজেদুল হক। সামনে জুবেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে মনে একটু অবাক হলেন তিনি। কিন্তু বন্ধুর ছেলেকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করতে ভুল করলেন না। 'জুবের নাকি? এস, এস। এই মাত্র ফিরলাম ঢাকা থেকে, বুঝলে...'

'আপনার স্যুইটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখি তো কাকা ফিরেছেন কিনা।' সিটিংরুমে ঢুকে বলল জুবের। 'কেমন হল শ্যুটিং?'

'ভাল,' বললেন সাজেদুল হক। অবাক হলেও, বন্ধুর ছেলে যখন এসেই পড়েছে, কিছুটা সময় নষ্ট করতে আপত্তি নেই তাঁর। 'চা, জুবের? নাকি কফি?' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'শুনলাম, ইফফাৎ সানিয়া খুন হয়েছে এখানে? সত্যি নাকি? মানে, ও কি সানিয়া না অন্য কেউ?'

'না কাকা, চা-টার কোন দরকার নেই,' জানালার সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। লক্ষ্য করল, বাঁধা অবস্থায় নয়, আলগা হয়ে ঝুলছে পর্দাগুলো। 'হ্যাঁ, সানিয়াই, তাই তো শুনছি।'

'ভেরি প্যাথেটিক।' রিস্টওয়াচ দেখলেন সাজেদুল হক। 'অমন ফুলের মতো একটা মেয়েকে...নিশ্চয়ই কোন পাগলের কাণ্ড।'

পাগলের কাণ্ড! সাথে সাথে মাথায় রক্ত চড়ে গেল জুবেরের। অনেক কষ্টে চেহারাটা স্বাভাবিক করে রাখল সে।

আরেকবার রিস্টওয়াচ দেখলেন সাজেদুল হক। বললেন, 'আমাকে একটু বাইরে বেরুতে হবে, তুমি বসো, আমি কাপড়টা বদলে আসি...' পাশের ঘরে চলে গেলেন তিনি।

পর্দার লাল রশিটা টেনে খুলে নিল জুবের। গোল পাকিয়ে পকেটে ফেলে রাখল। তারপর আরেক পকেট থেকে দুটো নীল পুঁতি বের করে ছড়িয়ে দিল সোফার নিচে। কাপড়চোপড় পরে সাজেদুল হক যখন আবার এ-ঘরে ফিরে এলেন, জুবের তখন একটা সোফায় বসে আছে। সাজেদুল হককে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'কাকা, আমি তাহলে আসি। বাবা রামুতে গেছেন জানেন নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমার বাবার সাথে আজ লাঞ্চ খাবার কথা আছে... আবার এস, কেমন গল্প করা যাবে।'

'আসবো,' বলে ত্রিশ নম্বর স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল জুবের। বেরিয়েই দেখল সহকারী ইন্সপেক্টর আর সহকারী ম্যানেজারকে নিয়ে করিডোরের ওধারের একটা স্যুইটে ঢুকছে গোলাম কিবরিয়া। তাকে ওরা কেউ দেখতে পায়নি। নিজেদের স্যুইটে ফিরে এল সে। বেডরুমে ঢুকে দেরাজ খুলে ভেতরে রাখল রেশমী রশিটা, তার সাথে ক্ষুর আর অবশিষ্ট পুঁতিগুলো। দেরাজটা বন্ধ করে তালায় চাবি দিল।

সাঁতারের পোশাক নিয়ে স্যুইট থেকে আবার বেরিয়ে এল জুবের। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো বিশালদেহী কনস্টেবল অলসভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল একবার। মনে মনে হাসল জুবের। এতক্ষণ কি করছিল ও তা যদি জানতো লোকটা।

•

বিকেল সোয়া তিনটে। ক্রিং...ক্রিং...।

নোটবুক থেকে মুখ তুলে বিরক্তির সাথে ফোনের দিকে তাকাল গোলাম কিবরিয়া। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে বেসুরো গলায় বলল, '...হ্যাঁ, কি ব্যাপার?'

ফোন করছে সহকারী সনাতন। অপরপ্রান্ত থেকে বলল. 'তিন তালায় চলে আসুন, ইন্সপেক্টর।' উত্তেজনায় ভাল করে কথা বলতে বাধছে তার। 'আমরা কামরাটা খুঁজে পেয়েছি...মানে, যে-কামরায় খুনটা হয়েছে...'

'হোয়াট!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ইন্সপেক্টর। 'আসছি!' রিসিভার রেখে দিয়ে ঝড়ের গতিতে কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল সে। এক সাথে তিনটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে দেখল, কয়েকজন সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের ঝামেলা যে হতে পারে তা সনাতন আগেই টের পেয়েছিল, তাই সাদা পোশাক পরা দু'জন কনস্টেবলকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল সে। তারা সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের পিছু হাটিয়ে দিল। ত্রিশ নম্বর স্যুইটে ঢোকার আগে ইন্সপেক্টর ভিড়ের দিকে ফিরে বলল, 'একটু পরই সব জানতে পারবেন আপনারা।'

স্যুইটে ঢুকল গোলাম কিবরিয়া। সনাতন তার সামনে এসে দাঁড়াল। এই সিটিংরুমের জানালার একটা পর্দার রশি পাওয়া যাচ্ছে না,' বলল সে। 'আর ওই সোফার নিচে দুটো নীল পুঁতি পড়ে রয়েছে।'

বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল গোলাম কিবরিয়ার মুখে। 'জট বোধহয় খুলতে শুরু করল, কি বল? স্যুইটটা কার?'

সামনে এসে দাঁড়াল সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদ। 'পরিচালক সাজেদুল হকের। গতরাতে তিনি এখানে ছিলেন না, ঢাকা থেকে আজ সকালেই ফিরেছেন।'

'তার মানে রাতে এটা খালিই ছিল।'

'হাঁ।'

সিটিংরুমের চারদিকে চোখ বুলাল গোলাম কিবরিয়া। 'পুঁতি-গুলো…?'

'সোফার নিচ থেকে বের করা হয়নি,' বলল সনাতন। তার ইঙ্গিতে দু'জন কনস্টেবল এগিয়ে এসে সোফাটা সরিয়ে নিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর দেখল, কার্পেটের ওপর বড় আকারের দু'টো পুঁতি পড়ে রয়েছে। 'এই দুটোই, আর নেই?'

'নেই।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ইন্সপেক্টর। 'ঠিক যেভাবে আছে ওভাবেই ফটো তুলতে হবে পুঁতি দুটোর। তারপর পরীক্ষা করাও হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।' সুলতান আহমেদের দিকে তাকাল সে। 'হক সাহেব ঢাকায় যাবার সময় নিশ্চয়ই দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে এই স্যুইটে কেউ ঢুকল কিভাবে?

'আরেকটা চাবি যোগাড় করা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়,' মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সুলতান আহমেদ। 'অনেক সময় রুম সার্ভিসও তালায় চাবি রেখে যায়—ভুল করে।

'এই কামরায় হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে, কাজটা করতে আমার লোকেরা সময়ও নেবে প্রচুর। আপনি কি হক সাহেবের জন্যে অন্য একটা স্যুইটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'তা পারা যাবে।'

সহকারীকে এক পাশে টেনে এনে গোলাম কিবরিয়া বলল, 'শফিক সাহেবকে এখুনি খুঁজে বের করা দরকার। সাংবাদিকদের সমস্ত

ব্যাপার খুলে বলতে যাচ্ছি আমি। ওদেরই পেশার এক লোককে খুনী বলে সন্দেহ করছি বলে ওরা হয়ত মনক্ষুণ্ন হবে, কিন্তু তোমার কি মনে হয় অসহযোগিতা করবে?'

'তা করবে বলে মনে হয় না। ওঁরা সব শিক্ষিত মানুষ…জানেন, আইন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোবেই…'

'বুলেটিনে ওদেরকে আমি শফিক সাহেবের ছবি ছাপার অনুরোধ করব,' বলল ইন্সপেক্টর। 'তিনটে ভাষাতে ছাপা হচ্ছে বুলেটিন, খবরটা ওই তিন ভাষাতেই ছাপতে চাই আমি। তুমি এদিকে মাহবুব হোসেনকে খবর দিয়ে আনাও। পুঁতিগুলো সে হয়ত সনাক্ত করতে পারবে।'

'ঠিক আছে,' বলল সনাতন। 'কিন্তু খবরটা তিন ভাষায় ছাপার দরকার কি?'

'আমার ধারণা, শুধু একটা খুনীকে নয়, একটা ম্যানিয়াককে খুঁজছি আমরা,' বলল গোলাম কিবরিয়া। 'এ-ধরনের ম্যানিয়াকরা একের পর এক খুন করতে পারে। বিদেশীরাও তার হাত থেকে নিরাপদ নয়। ওদেরকেও সতর্ক করার দরকার আছে।'

'ঠিক আছে,' বলে বেরিয়ে গেল সনাতন। কিন্তু একটু পরই ফিরে এসে বলল, 'দারোয়ান পুঁতিগুলো চিনতে পেরেছে। সানিয়ার গলায় এই পুঁতির হারই দেখেছিল সে।'

আবার বেরিয়ে গেল সনাতন। একটু পর ইন্সপেক্টরও করিডোরে বেরিয়ে এল। সাংবাদিকদের নিয়ে নিচের অফিস কামরায় ঢুকল সে।

সাংবাদিকরা বিস্মিত হলেও, শফিকুর রহমান বাবুকে খুনী বলে সন্দেহ করায় খুব একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলল না তারা। সবাই ধরে নিল, পুলিশের হাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু তথ্য আছে যার

সাহায্যে শফিককে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। তারা সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল। এর একটু পরই আবার ফিরে এল সনাতন।

'পুঁতিগুলোয় হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।' উত্তেজিতভাবে ঘোষণা করল সে।

'ওয়াণ্ডারফুল।' দুম করে টেবিলের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল গোলাম কিবরিয়া। 'আর কোন খবর?'

'একজন ইনফর্মার বলছিল, সে নাকি কার কাছ থেকে শুনেছে, মেইন রোডের দু'পাশের হোটেলগুলোর কোনো একটায় থাকে শফিকুর রহমান। কিন্তু ওদিকে সব ক'টা হোটেলই তো খোঁজ করা হয়েছে।'

'আর একবার লোক পাঠিয়ে ভাল করে খোঁজ কর,' নির্দেশ দিল গোলাম কিবরিয়া। 'কেউ হয়ত তাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। আর শোন, ওদিকে দোকান-পাটগুলোতেও লোক পাঠাও।'

'কেন?'

'বলা যায় না, দোকানদাররা হয়ত তাকে দেখে থাকতে পারে। হোটেলে যারা যাওয়া-আসা করে তাদের ওপর দোকানদাররা নজর রাখে, মনে করে এরাই আসল খদ্দের।'

অফিস কামরায় একজন কনস্টেবল ঢুকল। 'স্যার, পুঁতির ছাপের সাথে লিফটের ছাপ হুবহু মিলে গেছে। রেকর্ড-পত্র এখানে নেই, থানায় গিয়ে পরীক্ষা করার কথা বলছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট…'

'ভেরি গুড,' উৎসাহের সাথে বলল গোলাম কিবরিয়া। পর মুহূর্তে অন্যমনস্ক দেখাল তাকে।'…ওই হাতের ছাপটা যদি শফিকুর রহমানের হয়…'

নয়

বিকেল পাঁচটার পর আর মনের ওপর জোর খাটল না, সৈকত থেকে উঠে গোল্ডেন ইনের দিকে পা বাড়াল জুবের। জিনেতকে আরেকবার কাছ থেকে দেখার সাধটা অদম্য হয়ে উঠেছে। অথচ জানে, তার সাথে ঘনঘন দেখা করা উচিত নয়।

প্রচুর ভিড় মেইন রোডে। লোকজন কেনাকাটায় ব্যস্ত। হঠাৎ জুবেরের মনে হল, এই ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই সাদা পোশাক পরা পুলিশের লোক ঘোরাফেরা করছে। সতর্ক, সচেতন হয়ে উঠল সে। এবং একটু মনোযোগ দিয়ে চারদিকে তাকাতেই পুলিশের লোক-গুলোকে চিনতে অসুবিধে হল না তার। দু'জন করে দল বেঁধেছে তারা, জোড়ায় জোড়ায় দোকানে ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে একটু পর, আবার ঢুকছে পাশের দোকানে।

একটা জোড়াকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল জুবের। বুঝল, ওর সামনের দোকানে ঢুকতে যাচ্ছে তারা। দেরি না করে আগেভাগেই দোকানটায় ঢুকে পড়ল সে। ভেতরটা ফাঁকা, সেলস-ম্যান ছাড়া আর কেউ নেই। কাউন্টারের এক ধারে কিছু বই দেখল জুবের, ঝুঁকে পড়ে তার ভেতর মুখ লুকাল। খানিক পরই দোকানে ঢুকল জোড়াটা। তাদের একজন সেলসম্যানকে বলল, 'আমরা থানার লোক। ঢাকা থেকে একজন সাংবাদিক এসেছেন, তাকে আমরা

খুঁজে পাচ্ছি না।' শফিকুর রহমান বাবুর চেহারার বর্ণনা দিল সে। তারপর জানতে চাইল, 'এই রকম চেহারার কোন লোককে দেখেছেন নাকি?'

'না তো।'

বিরক্ত হয়ে পুলিশ দু'জন বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল জুবেরের। সেই কালো ভূতটাকে এখনও তাহলে খুঁজে পায়নি ওরা। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো সে-ও। দেখল, লোক দু'জন আরেকটা দোকানে ঢুকছে।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গোল্ডেন ইনের সামনে চলে এল জুবের। রেস্তোরাঁর ভেতর অনেক লোক, দু'একজন মেয়েকেও দেখা গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে জিনেত নেই। ভেতরে ঢুকে কাউন্টারের কাছাকাছি বাইরের দিকে মুখ করে কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল সে। কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরাল।

জিনেতকে টেলিফোন করলে কেমন হয়? কিন্তু চিন্তাটাকে সাথে সাথে বাতিল করে দিল সে। জিনেতের বাবা হয়ত ঘরেই আছেন, জিনেত হয়ত অপ্রতিভ বোধ করবে। কিন্তু এখানে এভাবে কতক্ষণই বা বসে থাকবে সে? এই সময়, বাইরে থেকে রেস্তোরাঁয় জিনেতকে ঢুকতে দেখে বুকের ভেতর পুলকের দোলা অনুভব করল জুবের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ওকে দেখে জিনেতের চেহারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিষ্টি হেসে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'তুমি!'

'সেই পুরানো ব্যারাম—তোমাকে আরেকবার দেখার ইচ্ছেটা দমন করতে পারলাম না।' সামনের একটা চেয়ার দেখাল জুবের। 'বস। কোত্থেকে ফিরলে?'

বসল জিনেত। চেহারাটা কেমন যেন হঠাৎ করেই ম্লান হয়ে উঠল তার। 'বাবার সাথে সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে বাবার এক বন্ধুর মুখ থেকে এমন একটা খবর শুনলাম, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে আমার। সেজন্যেই তো বাবাকে রেখেই ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জুবেরের। চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল। নিশ্চয়ই খুনের খবরটা শুনেছে জিনেত। 'কি খবর ?'

'মেয়েটার সাথে বাবা একদিন সামান্য একটু আলাপও করেছিলেন,' বলল জিনেত। 'ফুলের মতো নিষ্পাপ, আর কি সুন্দর দেখতে। খুব ভাল লেগেছিল ওকে আমার। ইফফাৎ সানিয়া।' চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠল জিনেতের। জানো, 'ওকে খুন করা হয়েছে। ভাবতে পার কথাটা !'

'তোমার জন্যে কফি আনাই, নাকি ভেতরের বারে গিয়ে বসতে চাও, জিনেত ?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল জুবের।

ভুরু জোড়া ক্ষীণ একটু কুঁচকে উঠে আবার সাথে সাথে রেখাগুলো মিলিয়ে গেল জিনেতের কপাল থেকে। 'খুন-খারাবীর কথা শুনতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না, জুবের ?'

ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডাকল জুবের। কফির অর্ডার দিল আবার। ওয়েটার চলে যেতে বলল, 'আমার শুধু তোমার কথা শুনতে ভাল লাগে।'

হেসে ফেলল জিনেত। সাদা গেঞ্জি আর নীল স্ল্যাকস পরেছে ও। শরীরের সাথে এঁটে বসা গেঞ্জির ভেতর পরিপূর্ণ যৌবন, সেদিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোকা বোকা লাগল নিজেকে জুবেরের। হঠাৎ তার মনে হল, নারী দেহ সম্পর্কে প্রায় কোন অভিজ্ঞতাই নেই তার।

'কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি, জুবের,' আগ্রহ এবং আবদারের সুরে বলল জিনেত। 'তুমি নিশ্চয়ই অনেক খবর জান…সব বল আমাকে। খুনীর পরিচয় জানতে পেরেছে ওরা? শুনলাম, বুলেটিনে নাকি ফরাসী ভাষাতেও এ-সম্পর্কে একটা খবর ছাপার ব্যবস্থা করছে তারা। সত্যি?'

'আমি যতদূর জানি, খুনীর পরিচয় জানতে পারেনি ওরা। তবে একজন লোককে খোঁজাখুঁজি করছে…'

'বদ্ধ একজন পাগল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতে গেলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার,' শিউরে উঠল জিনেত। 'আশা করি, পুলিশ তাকে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করতে পারবে…'

হতভম্ব দেখাল জুবেরকে। জিনেত এই রকম একটা কথা বলবে, ভাবতেও পারেনি সে। সবার মতো সে-ও তাহলে সানিয়ার খুনীকে একটা পাগল ধরে নিয়েছে। চিৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠতে ইচ্ছে করল-তার। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করল সে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'লোকটাকে পাগল বলছ কেন?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'একটা খুন করেছে বলেই কি তাকে পাগল বলে ধরে নিতে হবে? আমার কি ধারণা জান?'

'কি?' আগ্রহের আতিশয্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল জিনেত।

'আমার ধারণা, লোকটা নিজেকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করছে। নিজের সাহসের পরীক্ষা।'

'নিজের সাহসের পরীক্ষা করার জন্যে খুন? এ আবার কি ধরনের পাগলামী। এও তো এক ধরনের পাগলামো, তাই না?'

'পাগল মানে, যার মাথায় দোষ আছে। মানসিক ভাবে যে অসুস্থ। কোন লোক যদি তার নিজের সাহস পরীক্ষা করতে চায়;

তাকে তুমি অসুস্থ বলতে পার না।' খুনী পাগল, এ-কথা জিনেতকে ভাবতে দিতে চায় না জুবের।

যুক্তিটা মানল না জিনেত। 'কি অদ্ভুত কথা। সাহস পরীক্ষা করার জন্যে খুন করবে, অথচ পাগল নয়! আরে জুবের!' কৃত্রিম ভয়ে আঁতকে উঠল জিনেত, 'চিন্তা করে দেখেছ, তুমিও পাগলের মতো কথা বলছ!'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল জুবেরের। ছি, ছি,—মনের ভেতর থেকে কে যেন বিদ্রূপের সুরে বলল—শেষ পর্যন্ত জিনেতও তোমাকে পাগল ভেবে বসল। চোখ বুঁজে সিগারেটে টান দিল সে। তারপর কয়েক সেকেণ্ড পর আবার যখন চোখ মেলল, আগের চেয়ে অনেক বেশি লাল দেখাল সে-দুটো। জিনেতের চোখে চোখ রেখে সংযত গলায় বলল, 'শোন তাহলে। আমার নিজের ব্যাখ্যাটা দিই তোমাকে। খুন করে লোকটা নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এটুকু স্বীকার কর তো?'

'হ্যাঁ, করলাম স্বীকার। তাতে কি হল?'

'খুনটা···তাকে হয়ত বাধ্য হয়ে খুনটা করতে হয়েছে···এ ধরনের কিছু একটা না ঘটিয়ে তার হয়ত নিস্তার ছিল না। কোন মানসিক তাড়না···কিংবা হয়ত বিপদের সামনে পড়লে নিজের আচরণ কতটা বদলায়, নিজের ভেতর কি প্রতিক্রিয়া হয় এসব জানার প্রচণ্ড একটা বাসনা কাজ করেছে তার ভেতর। তার জীবনটা হয়ত একঘেয়ে, সে হয়ত নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, কেউ হয়ত তাকে ভালবাসে না, তাই কিছু একটা ঘটিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। এই খুন সমাজ, সংসার বা নিজের ওপর একটা প্রতিশোধও হতে পারে। আবার, বুদ্ধি, সাহস, কৌশল পরীক্ষা করার একটা ইচ্ছেও হতে পারে। পরীক্ষা না করলে কেউ জানতে পারে না ও-সব গুণ তার মধ্যে কি

পরিমাণে আছে।'

'কিন্তু পরীক্ষা করার আরো তো কত উপায় আছে—সেজন্যে একটা নিরীহ মানুষকে খুন করতে হবে?' কোমর বেঁধে তর্ক করার জন্যে জিনেতও সম্পূর্ণ তৈরি। 'কি ভয়ংকর!' আবার শিউরে উঠল সে। 'তোমাকে আর খুনীর পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে হবে না। স্বীকার কর, লোকটা পাগল।'

কিছুই জান না তুমি।' হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল জুবেরের। 'নিজেকে এমন অবস্থায় ফেলতে হবে, যেখান থেকে পিছু হটার কোন পথই নেই—সত্যিকারের সাহসের পরীক্ষা তাকেই বলে। অনেকে মনে করে একা ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দিলে বা এভারেস্টে চড়লে সাহসের পরীক্ষা হয়ে যায়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এ-ধরনের কাজে ঝুঁকি আছে, সাহসেরও দরকার আছে, কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে কারো যদি মনোবল নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা তারা যদি সামনে ভয়ংকর বিপদ দেখে ভাবে আর এগোনো উচিত হবে না তাহলে তারা মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু কাউকে যদি খুন কর তুমি, তোমার আর ফেরার পথ নেই। যাকে খুন করলে তাকে আবার তুমি প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পার না। খুন করার পর খুন করার আগের অবস্থাতে কোনোমতেই আর ফিরে যেতে পার না। এই অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ না? এই অবস্থাটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর নয়? শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কৌশল আর সাহসই তোমাকে এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে পারে। কাজেই এটা বুদ্ধি, সাহস আর কৌশলের পরীক্ষা।'

'দুর, এসব কোন যুক্তিই নয়। পরীক্ষা করতে চাও, কর, কিন্তু একজন মানুষকে খুন করে কেন? কোন উদ্দেশ্য ছাড়া, শুধু নিজের

সাহস পরীক্ষা করার জন্যে যে খুন করতে পারে, আমি বলব. দুনিয়ার সব মানুষ বলবে, সে একটা বদ্ধ পাগল।'

তীব্র প্রতিবাদ করে আবার কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জুবের। জিনেত আর যাই হোক, বোকা নয়। প্রসঙ্গটা নিয়ে বেশি কথা বলা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওর মনে কোন সন্দেহ উঁকি দিয়েছে কিনা কে জানে। মৃদু একটু হাসল সে। 'সে যাই হোক গে, আমাদের কিছু করার নেই, তাই না? তবে, এই আমি বলে রাখছি, দেখো, খুনী যখন ধরা পড়বে, কেউ তাকে পাগল বলবে না। তোমার আমার মতোই একজন সুস্থ মানুষ সে।'

জিনেত কিছু বলতে যাচ্ছে, এই সময় রেস্তোরাঁয় ঢুকল দু'জন সাদা পোশাক পরা পুলিশ। ওদেরকে দেখেই চিনতে পারল জুবের। কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল তারা, কথা বলছে ক্যাশিয়ারের সাথে। কাছাকাছি বসে থাকায় তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা।

একজন পুলিশ শফিকুর রহমানের শারীরিক বর্ণনা দিয়ে বলল, 'আমরা থানা থেকে আসছি। ভদ্রলোককে কোথাও দেখেছেন বলে মনে পড়ে?'

প্রৌঢ় ক্যাশিয়ার সাদাসিধে লোক, ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। ফটোগ্রাফার তো?' রাস্তার ওপারের হোটেল প্লাজার দিকে আঙুল তুলল সে। 'ওই হোটেলে উঠেছেন। কক্সবাজারে যখনই আসেন, ওই প্লাজাতেই ওঠেন তিনি।'

উৎসাহিত হয়ে উঠল পুলিশ দু'জন। একের পর এক আরো অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করল তারা।

এদিকে মনে মনে প্রমাদ গুণল জুবের। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিল সে। আড়চোখে দেখল, পুলিশ আর ক্যাশিয়ারের কথা

গোগ্রাসে গিলছে জিনেত, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। কি যে বুঝছে তা সেই জানে। নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল জুবের। রেস্তোরাঁর ভেতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট প্যাসেজে। সেখান থেকে ঢুকল বারে। কাউন্টারে কেউ নেই দেখে ফোন-গাইডটা টেনে নিয়ে প্লাজার নাম্বার খুঁজল। তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করল সেই নাম্বারে।

একটা মেয়ে পুরুষালি গলায় জানতে চাইল, 'হ্যালো?'

'আইরিন পারভিন?' চাপা গালায় বলল জুবের।

'হ্যাঁ—কি দরকার? কে আপনি?'

'খেয়াল করে শুনুন। দু'এক মিনিটের মধ্যে সাদা পোশাক পরা পুলিশের দু'জন লোক আপনার হোটেলে যাচ্ছে। শফিকুর রহমানকে খুঁজছে ওরা। আমার ধারণা, ওদের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানাও আছে…' রিসিভার নামিয়ে রাখল জুবের। বার থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল সে। আবার যখন রেস্তোরাঁয় ঢুকল, দেখল, তখনও কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের লোক দু'জন। একটা সিগারেট ধরাল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসল নিজের চেয়ারে। এক বর্ণ বুঝতে না পারলেও খুবই আগ্রহের সাথে এখনও ওদের কথা শুনছে জিনেত—জুবের যে উঠে গিয়েছিল, এখন আবার ফিরে এসে বসল এসব যেন কিছুই টের পায়নি সে। একটু পরই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল পুলিশের লোকগুলো।

'কি বলল ওরা?' ঝট করে জুবেরের দিকে ফিরে জানতে চাইল জিনেত।

হাসি দমন করে কাঁধ ঝাঁকাল জুবের। 'শুনিনি তো। একজনের খোঁজে আমি বারে গিয়েছিলাম।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'এখন

তাহলে উঠি, কেমন? একজনের সাথে দেখা করার কথা আছে, বোধ হয় দেরি হয়ে গেল।' উঠে দাঁড়াল সে। 'মাছ ধরতে যাচ্ছ তো?' জিনেত মাথা ঝাঁকাল। 'জেটির কাছে থাকব আমি।' জিনেতকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে এগিয়ে গেল সে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল। বিল মিটিয়ে দিয়ে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে।

প্লাজার সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে তাকাল জুবের। রেস্তোরাঁর কাউন্টারে মাইরিন পারভিনকে দেখল না সে।

প্লাজা। শফিকুর রহমান বাবুর কামরা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল পারভিন। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে শফিক, মেঝেতে পায়চারি করছে। পারভিনকে দেখে টলতে টলতে এগিয়ে এল সে। 'এস... পার-ভি-ভিন, এ-স।'

শফিকের কাঁধ দুটো ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল পারভিন। 'তোমার খোঁজে সমস্ত হোটেলে তল্লাশী চালাচ্ছে পুলিশ।' দ্রুত, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'তোমাকে লুকাতে হবে, শফিক।'

অর্ধেক নেশা ছুটে গেল শফিকের। 'আমাকে। আবার? কেন? আজ সকালেই তো একবার খুঁজে গেছে...'

'কেন খুঁজছে কে জানে,' বিরক্তির সাথে বলল পারভিন। 'কিন্তু এখুনি ওদের চোখে পড়া চলবে না তোমার।' কাঁধ ছেড়ে দিয়ে শফিকের একটা হাত ধরল সে। 'এস, তাড়াতাড়ি। তোমার জন্যে লুকাবার একটা জায়গা ঠিক করেছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'তোমার ইচ্ছেটা কি বলবে?' বিড় বিড় করছে শফিক। 'এত সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে লাভ কি'? আমি বরং ওদের সাথে থানায় গিয়ে ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলি। যাই বল, আমরা যা করতে চাইছি সেটা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছু নয়—মন থেকে সায় পাচ্ছি না, পারভিন। ফটোগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে সব কথা জানানোই ভাল…'

বারান্দা দিয়ে শফিককে টেনে নিয়ে যাবার সময় রেলিঙের কাছে থামল একবার পারভিন, ঝুঁকে পড়ে নিচেটা দেখে নিল। হলঘরের দরজা দিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরের খানিকটা অংশ দেখা যায়। পুলিশ হতে পারে এমন কোন লোককে দেখতে পেল না সে। আবার বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল সে।

'কি বলছি, শুনছ, পারভিন?' জড়ানো গলায় বলল শফিক। 'কাজটা ভাল হচ্ছে না। কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু…'

'ঘ্যানর ঘ্যানর করো না তো। সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।' একটা দেয়াল আলমিরার সামনে দাঁড়াল পারভিন। কবাট দুটো খোলার পর দেখা গেল টিনের ড্রাম, ঝাড়ন, ঝাঁটা ইত্যাদি নোংরা জিনিসে ভেতরটা ঠাসা। আলমিরার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লুকানো একটা বোতামে চাপ দিল সে। সাথে সাথে আলমিরার পিছন দিকের দেয়ালটা সরে গেল এক পাশে। ওপারে দেখা গেল ছোট একটা খুপরির মতো ঘর। ভেতরে টেবিল, চেয়ার আর ছোট একটা খাটের ওপর একজনের শোয়ার মতো বিছানা। সিলিঙের সাথে একটা ইলেকট্রিক বালবও ঝুলছে। পাশের ঘরের দেয়ালের সাথে একটা ভেন্টিলেটার রয়েছে, ও-পথেই বাতাস চলাচল করে। 'ঢুকে পড়। সাবধান, কোন আওয়াজ যেন না হয়। একটু পরই ফিরে

আসছি আমি। মনে থাকবে তো, কোন আওয়াজ নয়।'

পারভিনের সাথে তর্ক চলে না, কাজেই আলমিরার ভেতর ঢুকে পড়ল শফিক। সেখান থেকে টলতে টলতে পৌছুল খুপরির ভেতর। হঠাৎ ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দেয়ালটা আবার বেরিয়ে এসে আলমিরা আর ঘরের মাঝখানে পার্টিশন তৈরি করল।

বিশাল শরীরের তুলনায় ঝড়ের গতিতে শফিকের আগের কামরায় ফিরে এল পারভিন। শফিকের সমস্ত জিনিস-পত্র দ্রুত হাতে একটা স্যুটকেসে ভরে স্যুটকেসটা রেখে দিল আলমিরার ভেতর। খালি মদের বোতলটা ফেলে দিল জানালা গলিয়ে। তারপর নেমে এল নিচের হলঘরে। প্রায় সাথে সাথে আরেক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল পুলিশের দু'জন লোক।

'আপনারা! আজ সকালে একবার এসেছিলেন না?' কপালের চামড়ায় ভাঁজ তুলে বলল পারভিন। 'আবার কি চান?'

হোটেল প্লাজা এবং আইরিন পারভিন সম্পর্কে কিছুই জানতে বাকি নেই থানার লোকদের। এই প্লাজাতেই চোরাচালানীরা আড্ডা জমায়, তাদেরকে পুঁজি দিয়ে সাহায্য করে আইরিন পারভিন, শুধু অকাট্য প্রমাণ যোগাড় করা যায়নি বলে আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করা হয়নি।

একজন পুলিশ বলল, 'সকালে আপনি বলেছিলেন, শফিক সাহেব এখানে নেই। কিন্তু আমরা খবর পেলাম তিনি এখানে ছিলেন। হয়ত এখনও আছেন। আমরা হোটেলটা তল্লাশী করব।'

'সত্যি কথাই বলেছিলাম। আপনারা যখন আসেন, তখন তিনি ছিলেন না। কিন্তু আপনারা যদি জিজ্ঞেস করতেন, তিনি এখানে ছিলেন কিনা তাহলে বলতাম ছিলেন, কিন্তু চলে গেছেন। তল্লাশী

করবেন? বেশ তো, ভাল কথা, করুন।' প্রকাণ্ড মুখে সরল হাসি ফুটল। 'আইনের সাথে অসহযোগিতা করেছি, সে বদনাম কেউ দিতে পারবে না। আপনাদের কাছে সার্চ-ওয়ারেণ্ট আছে কিনা তাও আমি দেখতে চাই না, করুন সার্চ। কেউ যদি মিছে নিজের সময় নষ্ট করতে চায়, তাতে আমার কি।'

পুলিশের লোক দু'জন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর পারভিনের দিকে ফিরে কঠোর স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি বলছেন, শফিক সাহেব এখানে ছিলেন?'

'ছিলেন,' চুলের বেণীটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুকের কাছে এনে আলগা করছে সেটা পারভিন, চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব। 'সকাল ন'টার দিকে চলে গেছেন। ভাল করে শুনিনি, বোধহয় দোহাজারী যাবার কথা বলছিলেন। তবে ফিরে আসবেন। জিনিসপত্র কিছুই তো নিয়ে যাননি।'

'ঠিক আছে, কামরাগুলো দেখে আসি আমি,' একজন চলে গেল ভেতর দিকে।

অপর লোকটা বলল, 'কথার মারপ্যাচ দিয়ে আমাদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে কাজটা আপনি ভাল করেননি। একটা খুনের অভিযোগে খুঁজছি আমরা শফিক সাহেবকে...'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল পারভিনের। কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ পড়ল না। 'কি বললেন? খুন? শফিক সাহেবকে আপনারা খুনের অভিযোগে খুঁজছেন? হাসালেন দেখছি। ভদ্রলোক কক্সবাজারে এলে বরাবর আমার এখানেই ওঠেন। কাজেই তাঁকে আমি চিনি বললে ভুল হবে না। তিনি একটা মাছিও মারতে ভয় পান। তাকে খুনী মনে করার কারণ কি বলুন তো?'

'কারণ নয়, আমাদের হাতে প্রমাণ আছে—ফাঁসিতে ঝোলা-বার জন্যে যথেষ্ট।'

বিশ মিনিট পর প্রথম লোকটা ক্লান্ত হয়ে নেমে এল নিচের হলঘরে। 'কোন ঘরই দেখতে বাকি রাখিনি। শফিক সাহেব এখানে নেই।'

অপর লোকটা হোটেল রেনবোয়, ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়াকে ফোন করল। সব শুনে অপরপ্রান্ত থেকে বলল সে, 'ওখানে তাহলে নেই তিনি?'

'থাকলে দেখতে পেতাম, স্যার।'

'বাইরে কোথাও থেকে প্লাজার ওপর নজর রাখতে হবে। রশি-দকে রেখে ফিরে এস তুমি। রশিদকে সাহায্য করার জন্যে আরো একজনকে পাঠাচ্ছি এখান থেকে। রশিদকে বলে দাও, শফিক সাহে-বকে ফিরতে দেখলেই যেন গ্রেফতার করে নিয়ে আসে আমার কাছে।'

'ইয়েস, স্যার।'

প্লাজা ছেড়ে বেরিয়ে এল লোক দু'জন। রেস্তোরাঁ থেকে পার-ভিন দেখল, তাদের একজন সোজা গিয়ে ঢুকল গোল্ডেন ইনে। দর-জার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল সে, ওখান থেকে প্লাজায় ঢোকার পথটা পরিষ্কার দেখা যায়।

নিজের অফিস কামরায় এসে টেবিলের সামনে বসল পারভিন। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথাটা। জেসমিন আলমকে অত বেশি সময় দেয়া বোকামি হয়ে গেছে। দেনা-পাওনাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। অবস্থা বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাই জানে এরা শফিকের বিরুদ্ধে কি ধরনের প্রমাণ যোগাড় করেছে। হাত

বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল সে। হোটেল রেনবোর নাম্বারে ডায়াল করল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে অপারেটর জানাল, মিসেস জেসমিন হোটেলে নেই, কখন ফিরবেন তাও জানা যায়নি।

আলমিরা থেকে এক বোতল বিদেশী মদ নিয়ে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল পারভিন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। এক মিনিট পর তাকে সেই খুপরির ভেতর, শফিকের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল।

বিছানার কিনারায় বসে দর দর করে ঘামছে শফিক। কাল কুৎসিত চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। 'আর দেরি করার কোন মানে হয় না, পারভিন। এসব সামলান আমার কাজ নয়। সইবে না। বুঝলে, এসব আমার সইবে না। ঠিক করেছি, এখুনি আমি পুলিশের কাছে যাব।'

বিদেশী মদের বোতলটা শফিকের নাকের সামনে তুলে এদিক ওদিক দোলাল পারভিন। 'একটু চেখে দেখবে নাকি?' শফিকের চোখ দুটো লোভে চক চক করে উঠতে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। 'তোমার জন্যেই এনেছি, নাও।' ছোঁ মেরে বোতলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল শফিক।

'তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।'

'কিভাবে শুনি?' বোতলের ছিপি খুলে ঢক ঢক করে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢালল শফিক। 'পুলিশ আমাকে খুঁজছে কেন?... ওরা যদি আমাকে খুঁজে না পায়, ধরে নেবে আমিই বোধহয় খুনটা করেছি।'

'দূর, দূর!' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়ল পারভিন। 'ওরা

জানতে পেরেছে খুনের আগে এবং পরে রেনবোয় তুমি ছিলে। তুমি কিছু জান কিনা, কিছু দেখেছ কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই এত খোঁজাখুঁজি করছে—ওরা এত বোকা নয় যে তোমাকে খুনী বলে মনে করবে।'

'তা মনে না করলেও আমরা যেটা করতে চাইছি সেটাও কোন ভাল কাজ নয়। টাকার লোভে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে রাজি নই আমি, পারভিন। বিশ লাখ টাকা…অত টাকা দিয়ে কি করবই বা? না, পারভিন। আমি পুলিশের কাছে যাই, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না।'

'বেশ,' বলল পারভিন। 'বাধা দেব না। কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে হলে একটু অপেক্ষা করে গেলে ক্ষতি কি? তার আগে জেসমিন আলমের কাছ থেকে যদি জড়োয়া সেটটা বাগিয়ে নিতে পারি, মন্দ কি।'

'তার মানে টাকার লোভ তুমি ছাড়তে পারছ না।' প্রতিবাদের সুরে বলল শফিক। 'উঁহু, এসবের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না। আমি এখুনি পুলিশের কাছে যাব।'

'কিন্তু আমি যে ওদেরকে বলেছি তুমি দোহাজরা গেছ, কালকের মধ্যে ফিরে আসবে? এখন যদি থানায় যাও তুমি, আমাকে ওরা মিথ্যেবাদী ভাববে। ভবিষ্যতে সেটা আমার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে, তাই না?'

'হুঁ,' ইতিমধ্যে হুইস্কির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শফিকের মাথার ভেতর। 'কিন্তু ওরা যদি জানতে চায় দোহাজরায় কেন গিয়েছিলাম, কি বলব?'

'কি বলতে হবে তা আমি বাতলে দেব,' হাসিমুখে বলল পার-

ভিন। 'ওখানে আমার জানাশোনা লোক আছে, তারা হলপ করে বলবে তোমাকে তারা দেখেছে। চিন্তা কর না, শফিক। আমার ওপর ভরসা রাখ, ভাগের দশ লাখ টাকা কোন পরিশ্রম ছাড়াই পেয়ে যাবে তুমি।'

'দশ লাখ?'

'আধাআধি ভাগ হবে টাকাটা, তাই না?' হাসল পারভিন। 'নাকি আমাকে আরো বেশি দিতে চাও তুমি?'

সচেতন হয়ে উঠল শফিক। 'না, তা কেন…'

খিল খিল করে হেসে উঠল পারভিন। 'ঠাট্টা করছিলাম। ভাগটা ওই আধাআধিই হবে। এখন তাহলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, কেমন? পুলিশের কাছে কখন যেতে হবে তা আমিই তোমাকে বলে দেব।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ সব ম্যানেজ করতে পারবে…'

মুখে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল পারভিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল শফিক।

রাত দশটা।

গোল্ডেন ইন আর প্লাজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে জুবের। টেবিলের ওপর খোলা রয়েছে আজকের সান্ধ্য বুলেটিন, সেটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে সে। শফিকুর রহমান বাবুর ফটো ছাপা হয়েছে বুলেটিনে। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে, সানিয়া হত্যার ব্যাপারে শফিক সাহেব সাহায্য করতে পারবেন মনে করে তাকে খোঁজা হচ্ছে। বিবৃতিটা ইংরেজী, বাংলা এবং ফরাসী ভাষায় ছাপা হয়েছে।

বুলেটিন থেকে মুখ তুলে সিগারেট ধরাল জুবের। চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবল, প্লাজায় কি এখনও আছে শফিক? নাকি সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে গেছে অন্য কোথাও?

সন্ধ্যার পর থেকে কয়েকবার এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করেছে সে। গোল্ডেন ইনে বসে থাকা পুলিশের লোক দু'জন তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। ওদেরকে বসে থাকতে দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার, প্লাজার ওপর নজর রাখছে ওরা।

প্লাজায় ঢোকা এখন তার জন্যে একটা ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, অস্বস্তির সাথে ভাবল জুবের। কিভাবে যে ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়...

মিনিট দশেক পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে যাবে, হঠাৎ করে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আটকে গেল। বৃষ্টি ছাড়ার অপেক্ষায় আবার টেবিলে এসে বসল সে। এই সময় বুদ্ধিটা এল মাথায়।

একটু পরই ছেড়ে গেল বৃষ্টি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বড়সড় দেখে একটা দোকানে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল একটা ছাতা আর সুটকেস নিয়ে। ছাতা কিনল চেহারাটা আড়াল করার জন্যে, আর স্যুটকেসটা প্লাজার আইরিন পারভিনকে বোকা বানাবার উদ্দেশ্যে। একেবারে খালি হাতে রুম ভাড়া নিতে গেলে হোটেলের লোকেরা নানা রকম সন্দেহ করে। অনেক সময় ঘর খালি নেই বলে বিদায় করে দেয়।

সামান্য একটু বৃষ্টি হলেও রাস্তায় এখানে সেখানে পানি জমে গেছে। গোল্ডেন ইনের কাছাকাছি এসে ট্রাউজারের পায়া দুটো ভাঁজ করে গুটিয়ে নিল জুবের। গোল্ডেন ইনে বসা পুলিশের লোক দু'জন

নিশ্চয়ই জানে শফিকুর রহমানের গায়ের রঙ আলকাতরার মতো কালো। হাঁটু পর্যন্ত ট্রাউজার গুটানো ফর্সা পা দুটো দূর থেকে দেখে অনায়াসে বুঝতে পারবে তারা, লোকটা শফিকুর রহমান বাবু নয়। ছাতাটা মাথার ওপর মেলে নিয়ে এগোল জুবের। গোল্ডেন ইনের পাশ দিয়ে এগোবার সময় ঝুঁকি নিয়ে ভেতরে তাকাল একবার। পুলিশের লোক দু'জন নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। রেস্তোরাঁর ভেতর পরিচিত কাউকে দেখল না সে।

প্লাজার রেস্তোরাঁয় ঢুকে থামল না সে, সোজা ঢুকে পড়ল হলঘরে। এক পাশে একটা কাউন্টার, সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ঠিক এই সময় অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল আইরিন পারভিন। কাউন্টারে কেরাণীকে দেখতে না পেয়ে চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল তার। 'একটু চোখ সরাবার উপায় নেই, অমনি ফাঁকি দেবে···' গজ গজ করতে করতে এগিয়ে এল সে, দাঁড়াল কাউন্টারের সামনে, জুবেরের দিকে মুখ করে। রেজিস্টার বুকটা টেনে নিয়ে বলল, 'আপনার বুঝি রুম চাই?'

'হ্যাঁ,' বলল জুবের। 'সিঙ্গেল রুম। দোতালায় হলে ভাল হয়।'

'সিঁড়ির মাথার কাছে খালি আছে একটা রুম,' খাতায় চোখ রেখে বলল পারভিন। 'নাম?'

'আনিসুর রহমান,' বলল জুবের। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে বেল বাজাল পারভিন। ছুটে এল একজন বয়। স্যুটকেসটা তার হাতে না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল জুবের। কামরাটা দেখিয়ে দিয়ে বিদায় নিল রুম বয়। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল জুবের। বিছানার ওপর স্যুটকেস আর এক কোণে ছাতাটা রেখে দরজা বন্ধ করে দিল। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল ও। ভাবছে। এই হোটেলেরই কোথাও

আছে শফিকুর রহমান। নিশ্চয়ই তার সাথে ফটো আর নেগেটিভ-গুলো আছে। তার মানে শফিককে খুঁজে পেলেই ওগুলো পেয়ে যাবে সে…'

সাথে করে নিয়ে আসা জিনিসগুলো ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করল জুবের। পাকানো রশি, অনেকগুলো নীল পুঁতি, আর একটা ক্ষুর। খাপ থেকে ক্ষুরটা বের করল সে। খাপটা আবার রেখে দিল পকেটে। রিস্টওয়াচের ব্যাণ্ডের নিচে গুঁজে রাখল বন্ধ করা ক্ষুরটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কবাটে কান পাতল সে।

দশ

হোটেল রেনবো। সহকারী ম্যানেজার সুলতান আহমেদের অফিস কামরা।

প্লাস্টিকের একটা এনভেলাপ থেকে চিমটে দিয়ে ধরে নীল একটা পুঁতি বের করল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। টেবিলের ওপর সেটা রেখে সামনে বসা মাহবুব হোসেনের দিকে তাকাল সে। 'দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা ?'

ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল মাহবুব হোসেন। তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, 'পুঁতির মালা আর হার অনেকগুলো ছিল সানিয়ার, এটা হয়ত সেগুলোরই একটা। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে কিছু

বলতে পারব না।'

'পারবেন না কেন?' চটে উঠল ইন্সপেক্টর। 'আপনিই বলেছেন, সানিয়া একটা পুঁতির হার পরেছিলেন। বলেছেন, খুন হবার আগে সৈকতে দেখা হয়েছে আপনাদের। তার গলায় তখন যে হারটা ছিল এটা সেই হারের পুঁতি কিনা বলতে না পারার কি কারণ থাকতে পারে। এমন ভুলো মন হলে চলে নাকি। মনে করে দেখুন ...'

কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফুটে উঠল মাহবুব হোসেনের। 'কি বললেন? সৈকতে ওর গলায় হার ছিল? অসম্ভব।'

'অসম্ভব মানে। নিশ্চয়ই ওর গলায় হার ছিল, আমার কাছে প্রমাণ আছে...'

'ছিল না,' দৃঢ় স্বরে বলল মাহবুব হোসেন।

'কিন্তু আপনিই আমাকে বলেছিলেন, সবসময় হার পরার অভ্যেস ছিল তার...'

'বলেছিলাম, কিন্তু সৈকতেও হার পরে যেত তা বলিনি। সাঁতার কাটতে যাবার সময় কখনও হার পরে যেত না ও। ওর এই সতর্কতা সম্পর্কে আমি জানি, তাই এত জোর দিয়ে বলছি। সাঁতারের পোশাক খোলার পর হার পরত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, সে-সময় ওর যে-ছবিগুলো তোলা হয়েছে, সেগুলো এনে দিচ্ছি, নিজের চোখেই দেখুন।'

উত্তেজনায় একটা ঢেউ বয়ে গেল ইন্সপেক্টরের বুকের ভেতর। 'এখুনি দেখাতে পারবেন ছবিগুলো?'

'নিয়ে আসছি,' বলে উঠে দাঁড়াল মাহবুব হোসেন। কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল ইন্সপেক্টর। পরিষ্কার মনে আছে তার, জুবের আলম বলেছিল সৈকতে ছাড়া আর কোথাও সানিয়াকে দেখেনি সে। ওই সৈকতেই তার গলায় পুঁতির হারটা দেখেছিল জুবের। চোখ না খুলেই একটা সিগারেট ধরাল গোলাম কিবরিয়া।

দশ মিনিট পর ফিরে এল মাহবুব হোসেন। 'এই নিন।'

চোখ মেলে টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটা ফটো তুলে নিল গোলাম কিবরিয়া। খুঁটিয়ে দেখার কোন দরকার হল না, কোন ছবি-তেই সানিয়ার গলায় হার নেই। 'ধন্যবাদ, হোসেন সাহেব। অত্যন্ত মূল্যবান একটা তথ্য পেলাম আপনার কাছ থেকে।'

মাহবুব হোসেন চলে যেতেই হাঁক ছেড়ে সনাতনকে ডাকল ইন্সপেক্টর। কাছে পিঠেই ছিল, সনাতন সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল সে।

'জুবের আলমকে দরকার আমার। তিনি কি স্যুইটে আছেন?'

'দেখছি, 'বলে বেরিয়ে গেল সনাতন। একটু পরই ফিরে এসে জানাল, 'দারোয়ান বলল, নেই।'

'দারোয়ানকে তাহলে বলে রাখ, জুবের আলম ফিরলেই তাকে যেন বলা হয় আমি তার সাথে কথা বলতে চেয়েছি।'

'কোথায় আছেন খোঁজ করে দেখব নাকি?'

একটু চিন্তা করল ইন্সপেক্টর। তারপর বলল, 'না, তার কোন দরকার নেই। গুণী লোকের ছেলে, যাতে কোন রকম বাড়াবাড়ি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। ফিরুক, তখন কথা বললেই চলবে।'

কিন্তু জুবের যখন ফিরল, হোটেলের দারোয়ান তখন টুলে বসে ঝিমুচ্ছে। জুবেরকে সে দেখতেই পেল না। আবার যখন বেরিয়ে গেল জুবের, তখনও ঝিমুনি থামেনি তার।

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল গোলাম কিবরিয়া, জুবের আলম ফেরেনি মনে করে থানায় ফোন করল সে। নির্দেশ দিল, 'জুবের আলমকে খুঁজে বের কর। জরুরী ব্যাপার। দেখা পেলেই আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে তাকে।'

রাত এগারোটা। প্লাজা।

থপ থপ পায়ের আওয়াজ শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল জুবের। দরজার কবাটে এখনও কান ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এমন ভারি আওয়াজ, নিশ্চয়ই পারভিনের। দরজার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল শব্দটা। ছিটকিনি আগেই খুলে রেখেছে জুবের, এবার নিঃশব্দে ফাঁক করল কবাট। উঁকি দিতেই দেখল, করিডোরের শেষ মাথায় একটা আলমিরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে পারভিন। হাতে একটা প্লেট, ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

আলমিরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল পারভিন। লুকানো বোতামে চাপ দিয়ে দেয়ালটা সরাল। খুপরির ভেতর ঢুকে দেখল, বিছানার ওপর শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে শফিক। তার বুকে একটা হাত রেখে একটু ঠেলা দিল সে, বলল, 'অ্যাই, তোমার খিদে পায়নি?' হাতের প্লেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে।

ঘুম ভাঙলেও নেশা ভাঙল না শফিকের। কোন রকমে এক চোখ মেলেই আবার সেটা বন্ধ করল। 'য়্-যাও তুমি। একা থাকতে দাও আমাকে...'

খুপরি থেকে আলমিরায়, সেখান থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল পারভিন। দেয়াল আর দরজাটা বন্ধ করতে ভুল করল না সে।

সোজা নেমে এল নিচে। হোটেলের কর্মচারীদের নির্দেশ দিল, রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে তালা লাগাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে পারভিনের নির্দেশটা শুনল জুবের। পারভিনকে অফিস কামরায় ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ভাবল, এখুনি আর সে ওপরে আসবে না। সময় নষ্ট না করে আলমিরার সামনে এসে দাঁড়াল। তার সন্দেহ যদি মিথ্যে না হয়, এর ভেতরই লুকিয়ে আছে শফিকুর রহমান। আলমিরার কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল কবাট দুটো। অন্ধকার। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল। ঝাড়ন, ঝাঁটা, ড্রাম ইত্যাদি নোংরা জিনিস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। এর ভেতরে ঢুকে কি করছিল পারভিন? হাতের প্লেটটাই বা কোথায় রেখে গেছে? খোঁজাখুঁজি করতেই লুকানো বোতামটা পেয়ে গেল সে। চাপ দিতেই মৃদু ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে একপাশে সরে যেতে শুরু করল দেয়ালটা।

খুপরির ভেতর ঢুকল জুবের। সুইচবোর্ড খুঁজে আলো জ্বালল। আচ্ছা। বিছানার ওপর চোখ পড়তেই ভাবলো সে, শফিক মিয়া তাহলে এখানে।

ঘুমন্ত শফিকের পাশে এসে দাঁড়াল জুবের। রিস্টওয়াচের ব্যাণ্ডের নিচে থেকে ধীরে ধীরে বের করল ধারাল ক্ষুরটা। নিঃশব্দে বসল বিছানার কিনারায়। একটা হাত রাখল শফিকের কাঁধে। ঝাঁকি দিল।

শক্ত হাতের ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল শফিকের। চোখ মেলে জুবেরকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না সে। কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়ছে, ব্যথা অনুভব করল সে। মাথাটা তুলতে গেল, কিন্তু বুকের ওপর দুম করে একটা ঘুসি খেয়ে শুয়ে

পড়ল আবার। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি, সারা শরীরে ঘাম। প্রচণ্ড নেশার মধ্যেও মনে ভয় ধরে গেল তার। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না, ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে। 'আ-আপনি। এখানে কি-কিভাবে এ-এলেন?' চিঁ চিঁ করে জানতে চাইল সে।

'ফটো আর তার নেগেটিভগুলো কোথায়?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল জুবের।

'কি বলছেন। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমার হাতের দিকে তাকান,' হুকুম করল জুবের। ক্ষুরটা খুলে শফিকের চোখের সামনে ধরল। বৈদ্যুতিক আলো লেগে ঝিক করে উঠল ফলাটা। ভয়ে কুঁকড়ে গেল শফিক। 'ভালয় ভালয় দেবেন, নাকি...?' চোখের দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল জুবেরের, অর্থহীন হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'দিচ্ছি,' কাঁপা হাতটা বিছানার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা এনভেলাপ বের করে আনল শফিক। 'এই নিন...'

এনভেলাপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জুবের। দু'পা পিছিয়ে এসে খুলল সেটা। ভেতর থেকে তিনটে ফটো আর তিনটে নেগেটিভ বের করল। ক্ষুরটা টেবিলের ওপর রেখে পকেট থেকে লাইটার বের করল সে। এক এক করে সব ক'টা ফটো আর নেগেটিভে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মুচকি হাসল সে। 'এত সহজে দিয়ে দিলেন? একটু জোর খাটাতে হল না? এতই যখন ভয়, তাহলে টাকার লোভ করেছিলেন কেন? ভাল কথা, আর কোন ফটো বা নেগেটিভ নেই তো?'

টেবিল থেকে জুবেরকে ক্ষুরটা তুলে নিতে দেখে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল শফিকের। পাগলের মতো মাথা নাড়তে শুরু করল

সে। 'নে-নেই। আ-আর নেই। খোদার কসম। বিশ্বাস করুন...'

এই রকম ভয় পাওয়া একজন লোকের পক্ষে মিথ্যে কথা বলা সম্ভব নয়, ভাবল জুবের। আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ফটো আর নেগেটিভগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখল, টেবিলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে শফিক।

মদের বোতলটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা হুইস্কি গিলল শফিক। সাথে সাথে বুঝতে পারল পানি ছাড়া এতটা হুইস্কি খালি পেটে খাওয়া উচিত হয়নি তার। প্রতিক্রিয়া শুরু হতে দেরি হল না। ঘুরে গেল মাথা, হাত থেকে খসে পড়ল গ্লাসটা। চোখের সামনে রঙিন চশমা পরা জুবের আলমের মুখটা দেখতে পেল সে। মুখটা সরে গিয়ে সেখানে দুলতে শুরু করল লাল রশির একটা ফাঁস। খিক খিক করে হেসে উঠল শফিক। ভাবল, আরে শালা, আমি কি ছেলেবেলায় ফিরে গেলাম নাকি। চোখের সামনে মাটির পুতুল, কাগজের ফুল দেখতে পেল সে। তারপর স্ত্রীর চেহারাটা দেখতে পেয়েই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

ধীরে সুস্থে তার গলায় ফাঁসটা পরিয়ে দিল জুবের। এখনও কিছু টের পায়নি শফিক। আবার একবার কেঁদে উঠল সে। 'আমি গরু নাকি যে আমার গলায় দড়ি পরানো হচ্ছে।' বিড় বিড় করে বলল সে। তারপর হঠাৎ করেই, ফাঁসটা গলায় চেপে বসতে শুরু করায়, বুঝতে পারল সে, তাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অফিস কামরায় বসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিনেমা-পত্রিকার পাতা

ওল্টাচ্ছে আইরিন পারভিন। ছায়াছবিতে অভিনয় করার আশা প্রায় এক যুগ আগে ছেড়ে দিলেও কিন্তু জগতের খুঁটিনাটি সমস্ত খবর আজও তার রাখা চাই। রাত সোয়া এগারোটা হবে, এই সময় কান খাড়া হয়ে গেল তার। কিসের আওয়াজ? কয়েক সেকেণ্ড পর রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। সশব্দে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে এল হলঘরে।

দোতালার বাথরূম থেকে পানি পড়ার আওয়াজ আসছে। বাথরূমটা শফিক ছাড়া আর কাউকে ব্যবহার করতে দেয় না সে। নিশ্চয়ই কোন বোর্ডার রাস্তা থেকে মেয়ে ধরে এনেছে, একসাথে দুটো বাথরূম ব্যবহার করার দরকার পড়ায় করিডোরের বাথরূমটার কথা মনে পড়ে গেছে তাদের। কিন্তু কাজ সেরে পানির কলটা বন্ধ করেনি।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পারভিন। কিন্তু পানির শব্দ থামার কোন লক্ষণ নেই। রাগে সারা শরীর জ্বালা করে উঠল তার। অপচয় একেবারে সহ্য করতে পারে না সে। ভারি শরীর নিয়ে থপ্ থপ্ করে এগোল সিঁড়ির দিকে।

ভিড়ানো দরজার সরু ফাঁকে চোখ রেখে পারভিনকে ওপরে উঠে আসতে দেখল জুবের। কৌশলটা কাজে লাগছে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। বাথরূমের কল সে-ই খুলে রেখেছে।

বারান্দা ধরে এগোলো পারভিন। আপনমনে গজগজ করছে। বাথরূমের খোলা দরজার সামনে থামল সে। তারপর ভেতরে ঢুকে বন্ধ করল কলটা। একটু পরই বেরিয়ে এল আবার। ফিরে আসছে সিঁড়ির মাথার দিকে। জুবেরের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মস্ত একটা হাই তুলল। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঠিক তার পিছনেই বেরিয়ে এল জুবের, কিছুই টের পেল না সে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল পারভিন। একুশটা ধাপ প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে। প্রথম ধাপটা নামল সে, পিছনে শব্দ হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনের ভুল মনে করে আবার নামতে যাবে, এই সময় তার মাথার পিছনে শক্ত কি যেন একটা ঠেকল। ছ্যাং করে উঠল বুক। দ্রুত ঘাড় ফেরাতেই দেখল, কাল চশমা পরা একটা মূর্তি, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। আতংকে থরথর করে কেঁপে উঠল পারভিন। চিৎকার করার জন্যে মুখটা খুলল, কিন্তু কোন শব্দ বের হবার আগেই পিঠের ওপর দু'হাতের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল ভারি শরীরটা। সিঁড়ির ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে। মট করে কি যেন ভেঙে গেল। হলঘরের মেঝেতে পড়ে আরো খানিকদূর গড়িয়ে গেল লাশটা, একটা আলমিরার সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। আলমিরাটা টলে ওঠায় মাথার ওপর সার সার সাজিয়ে রাখা কাঁচের গ্লাসগুলো পড়ে গেল। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল বোর্ডারদের।

ইতিমধ্যে নিজের ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে জুবের। মুখটা ভিজে গেছে ঘামে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। না মরলেই ঝামেলা। মরেছে তো? অমন ভারি শরীরটা খাড়া সিঁড়ির ওপর দিয়ে নেমে গেল, মরবে না কেন। মট করে কি ভাঙল ওটা? ঘাড়? ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল সে।

নিচ থেকে হৈ-চৈ, শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। ছুটোছুটি, মেয়েদের কান্না। হোটেল গোল্ডেন ইনে বসা পুলিশের কানেও গোলমালের আওয়াজটা পৌঁছুল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়াল তারা। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে প্রাসাদের দিকে এগোল দু'জন।

এক মিনিট পর প্লাজার হলঘরে দেখা গেল তাদেরকে। সিঁড়ির কাছে আইরিন পারভিনের কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা পড়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে নারী-পুরুষের ভিড়। দোতালার বারান্দায়, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক বোর্ডার। সবাই স্তম্ভিত, হত-চকিত। পুলিশের একজন লোক এগিয়ে এসে পারভিনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। পারভিনের খোলা চোখের ভেতর থেকে মণি দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখের ওপর একটা আঙুল রাখল লোকটা। এক চুল নড়ল না পাতা। পালস দেখল সে। নেই। 'উনি বেঁচে নেই।' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সে। 'আমি টেলি-ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকছি, তুমি এঁদের সবার জবানবন্দি নাও।'

লোকটার কথা শেষ হওয়া মাত্র দোতালার বারান্দায় দাঁড়ানো নারী-পুরুষদের মধ্যে একটা অস্থির চাঞ্চল্য দেখা গেল। সবাই ছুটল সিঁড়ির দিকে, কে কার আগে নেমে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আরো পুলিশ এসে পৌঁছুবার আগে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে চায় সবাই। কিছু লোক পুলিশী ঝামেলায় পড়তে চায় না, আর কিছু লোক পালাতে চাইছে তাদের নামধাম প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে। কারণ এদের অনেকেই স্ত্রীকে গোপন করে বান্ধবী বা সদ্য পরিচিতা মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাবার জন্যে হোটেলের রুম ভাড়া করেছে।

কিন্তু হলঘরে নামার আগেই বাধা পেল তারা। রশিদ নামে পুলিশ কর্মচারীটা তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। 'জবানবন্দী না দিয়ে কেউ আপনারা হোটেল থেকে বেরুতে পারবেন না।' কঠোর সুরে বলল সে।

ইতিমধ্যে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে জুবের। কেউ

তার দিকে তাকিয়ে নেই দেখে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে সেই আলমিরা-টার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, লুকানো বোতামটায় চাপ দিয়ে আলমিরার পিছনের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলল। তারপর আলমিরা থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। আলমিরার কবাট দুটোও উন্মুক্তই থাকল।

নিজের ঘরে ফিরে এল জুবের। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ইলেক-ট্রিক বালবটা খুলে ফেলল সে। পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বের করে হোল্ডারের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল সেটা, তারপর জায়গা মতো আবার বসিয়ে দিল বালবটা। সাথে সাথে দপ করে নিভে গেল হোটেলের আলো।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়টা এই সুযোগে যেন একটা ঢেউ-য়ের মতো হুড়মুড় করে করে নেমে এল নিচের হলঘরে। রশিদকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা। তাদের সাথে জুবেরও।

হাঁটতে হাঁটতে সৈকতে চলে এল জুবের। এত রাতেও বেশ কিছু লোক হাওয়া খাচ্ছে। পরিত্যক্ত জেটিটা এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, সেদিকেই পা বাড়াল সে। জিনাত হয়ত আগেই পৌঁছে গেছে, অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। দ্রুত পা চালাল জুবের। খুশিতে ভরে আছে মনটা। একসময় সন্দেহ হয়েছিল, সব বুঝি ফেঁসে গেল। কিন্তু সাহস আর বুদ্ধির জোরে আবার সব ঠিকঠাক করে নিয়েছে সে। বিপদ দূর হয়ে গেছে, এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফটো আর নেগেটিভ-গুলোর অস্তিত্ব রাখেনি। যারা ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল, তাদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু প্রমাণও রেখে এসেছে সে, যা দেখে পুলিশ মনে করবে শফিকুর রহমান বাবুই খুন করেছে সানিয়াকে।

নিজের প্রশংসায় মনে মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জুবের। লাখে এক-জন লোকও এই রকম বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। লাখে? না, নিজেকে এত ছোট করে দেখার কোন মানে হয় না। সে যা করেছে তা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হত না। কোটিতে…

হঠাৎ একজন লোক তার পথ আগলে দাঁড়াল। 'মিঃ জুবের আলম?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল জুবেরের বুক। 'হ্যাঁ—আপনি?'

'সাব ইন্সপেক্টর রুহুল আমীন। ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া আপনার জন্যে হোটেল রেনবোয় অপেক্ষা করছেন। আমার সাথে আসুন, প্লীজ।'

কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছে সে? প্লাজা থেকে বেরুবার সময় পুলিশের লোক তাকে দেখে ফেলেনি তো? 'এখুনি?' অবাক হবার ভান করল জুবের। 'আমার সাথে একজনের একটা অ্যাপ-য়েণ্টমেণ্ট আছে…ইন্সপেক্টরকে গিয়ে বলুন, হোটেলে ফিরে তার সাথে দেখা করব আমি। এই দুটোর দিকে।'

'দুঃখিত, মিঃ জুবের,' সাব ইন্সপেক্টর বলল, 'ইন্সপেক্টর বলে দিয়ে-ছেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।' রাস্তার দিকে তাকাল সে, হাত তুলে একটা গাড়ি দেখাল। 'গাড়ি আছে, পৌছুতে বেশিক্ষণ লাগবে না। ইন্সপেক্টর কয়েক মিনিটের বেশি আটকে রাখবেন না আপ-নাকে। আসুন…'

এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল জুবের। 'বেশ, চলুন।'

গাড়িতে আরো একজন পুলিশ রয়েছে, ওরা উঠে বসতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

জুবেরের বুকের ভেতর দমাদম হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

এগার

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল গোলাম কিব-রিয়া, এই সময় দরজায় দেখা গেল জুবের আলমকে। 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

'আসুন, বসুন, মিঃ জুবের,' সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল গোলাম কিবরিয়া। 'হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।'

এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল জুবের। 'বারোটার সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল···কি এমন জরুরী কথা যে সেটা রাখতে দেয়া হল না আমাকে? যাই হোক, একটা টেলিফোন করতে পারি? তা না হলে একজনকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে হবে।'

'আমি দুঃখিত, মিঃ জুবের,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু আপনাকে যে কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা অত্যন্ত জরুরী। ঠিক আছে, আগে আপনি টেলিফোনটা সেরে নিন।'

ফোন গাইড দেখে গোল্ডেন ইনের নাম্বারটা বের করল জুবের। ক্রমেই পাওয়া গেল জিনেতকে। জুবের লক্ষ্য করল না, তার ডায়াল করাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল গোলাম কিবরিয়া, নাম্বারটা টুকে রাখল সাথে সাথে।

আজ রাতে জেটির কাছে দেখা করা সম্ভব নয়, কাল সকালে

দেখা হবে, কথাটা স্নিগ্ধকে বলে ক্রাডলে রিসিভার রেখে দিল জুবের। তারপর চেয়ারে বসে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল। 'বলুন, কি কথা?'

একটু নড়েচড়ে বসল গোলাম কিবরিয়া। 'আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, সানিয়ার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল সৈকতে, তাই না? সেটাই প্রথম আর শেষ, তারপর আর আপনার সাথে দেখা হয়নি তার, এই তো?'

সংগে সাথে ব্যাপারটা বুঝতে পারল জুবের। সেই পুঁতির হারের কথা। নাহ্, ইন্সপেক্টর লোকটা বোকা নয়। তার ভুলটা ঠিক ধরে ফেলেছে। রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে ইন্সপেক্টরকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ. তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ওই একবারই তার সাথে দেখা হয়েছিল আমার। কেন?'

'সকালে কথা বলার সময় আমি আপনাকে সানিয়ার হারের বর্ণনা দিতে বলেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে,' বলল জুবের। সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাকে। 'দিয়েওছিলাম বর্ণনা। কেন?' তার শান্ত ভাবভঙ্গি দেখে ইন্সপেক্টর যে অবাক হয়ে গেছে সেটা তার দৃষ্টি এড়াল না।

'হ্যাঁ হারের নিখুঁত বর্ণনাই দিয়েছিলেন…'এনভেলাপ থেকে ফটোগুলো বের করে জুবেরের সামনে রাখল গোলাম কিবরিয়া। 'দয়া করে এই ফটোগুলোর ওপর একটু চোখ বুলাবেন কি? আপনি যখন সানিয়ার সাথে সৈকতে কথা বলেন ঠিক তার আগেই এগুলো তোলা হয়েছিল।'

টেবিল থেকে তুলে নিয়ে ফটোগুলো দেখল জুবের। অনেকগুলো ফটো, কিন্তু কোনটাতেই সানিয়ার গলায় হার নেই। খানিক পর

সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিল সে। মুখ তুলে তাকাল ইন্সপেক্টরের দিকে। চোখে প্রশ্ন। 'দেখলাম। এবার?'

'কি দেখলেন?' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল গোলাম কিবরিয়া। 'খাপছাড়া কিছু চোখে পড়ল না?'

'খাপছাড়া?' ফটোগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল জুবের। 'না তো। কিছু আছে নাকি?'

চেয়ারে হেলান দিল ইন্সপেক্টর। চোখের দৃষ্টি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সানিয়ার গলায় হার নেই।'

'না থাকারই তো কথা, এটাকে আপনি খাপছাড়া বলছেন কেন?' সাথে সাথে বলল জুবের। 'সাঁতার কাটতে গিয়ে কেউ হার পরে থাকে বলে তো শুনিনি।'

নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখল গোলাম কিবরিয়া। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, 'কিন্তু আপনিই বলেছিলেন, হারটা দেখেছেন। তার সাথে আপনার শুই একবারই দেখা হয়েছিল সৈকতে। তাই যদি হয়, হারটা আপনি দেখলেন কখন?'

একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুবের, যেন ভারি অবাক হয়েছে। তারপর বলল, 'আপনি কি এই সাধারণ একটা কথা জানার জন্যে আমার সময় নষ্ট করছেন, ইন্সপেক্টর? সাংঘাতিক অন্যায়। হারটা সানিয়ার গলায় দেখেছি, আমি কি তাই বলেছিলাম? কথা বলার সময় ওর হাতব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা, বালির ওপর থেকে তুলে সেটা আমি ওর হাতে দিই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন কি?'

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জুবেরের দিকে তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টর। কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল। জুবেরকে বড়

বেশি শান্ত আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কেমন যেন বোকা বোকা লাগল নিজেকে তার। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত, মিঃ জুবের। আসলে…একটা খুনের কিনারা করতে হলে প্রত্যেকটি জবানবন্দী পরীক্ষা করে দেখতে হয়। আশা করি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না…'

চেহারায় নির্বিকার একটা ভাব ফুটিয়ে রাখল জুবের। কিন্তু মনে মনে আনন্দে আটখানা। লোকটাকে বুদ্ধিমান ভেবে ভুলই করেছিল সে। আসলে বোকার হদ্দ। এত সহজে জিতে গেল সে। বলল, 'না-না, ভুল বুঝব কেন।' উঠে দাঁড়াল সে। 'আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই তো?'

'না, আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই,' ম্লান গলায় বলল ইন্সপেক্টর।

'ধন্যবাদ,' ঘুরে দাঁড়িয়ে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জুবের।

জুবের বেরিয়ে যেতেই টেলিফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল গোলাম কিবরিয়া।

অপরপ্রান্ত থেকে উত্তেজিত গলায় সহকারী সনাতন বলল, 'হোটেল প্লাজায় শফিক সাহেবকে পাওয়া গেছে…'

'ভেরি গুড।' খুশিতে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠলো গোলাম কিবরিয়া। 'এখুনি তাকে থানায় নিয়ে যাও। আমিও রওনা হয়ে যাচ্ছি…'

'আপনি বরং এখানে চলে আসুন, ইন্সপেক্টর সাহেব,' বলল সনাতন। 'শফিক সাহেব মারা গেছেন।'

'কি।' ঝাড়া দশ সেকেণ্ড কথা যোগাল না গোলাম কিবরিয়ার মুখে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে তার।

'হাঁ। আমাদের ধারণাটাই ঠিক—তিনিই খুন করেছেন সানিয়াকে। একটা নীল পুঁতি পাওয়া গেছে তার পকেট থেকে। পর্দার লাল রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি…হোটেল রেনবোর রশি, যেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা।'

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করে গোলাম কিবরিয়া বলল, 'আমি আসছি।'

লবি পেরিয়ে বারে ঢুকতে যাবে, ভেতরে বন্ধুদের নিয়ে বাবাকে বসে থাকতে দেখে পিছিয়ে এল জুবের। এত রাতে ডিনারে বসেছেন ওঁরা। সিঁড়ি বেয়ে তিন তালায় উঠে এল সে। নক করতে স্যুইটের দরজা খুলে দিল জেসমিন। ভেতরে ঢুকে সেটা বন্ধ করল জুবের।

'কোথায় ছিলে তুমি?' চাপা গলায় বলল জেসমিন। 'কি করছিলে এতক্ষণ?' দু'চোখ ভরা সন্দেহ নিয়ে জুবেরের আপাদমস্তক দেখল সে।

'চিন্তার আর কিছু নেই,' অভয় দিয়ে হাসল জুবের। 'সব ঠিক করে ফেলেছি।'

'সব ঠিক করে ফেলেছ।' ফিসফিস করে বলল জেসমিন। 'কিভাবে? সব কথা খুলে বল আমাকে, জুবের। কি করেছ তুমি?'

'মেয়েলোকটার হোটেলে গিয়েছিলাম,' সেই অর্থহীন হাসিটা আবার দেখা গেল জুবেরের মুখে। 'ফটোগ্রাফারের সাথেও দেখা করেছি। একটু ভয় দেখাতেই ফটো আর নেগেটিভগুলো দিয়ে দিল। সব পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'ভয় দেখিয়েছ? ওই মেয়েলোকটাকে? তুমি?' দু'চোখ ভরা

অবিশ্বাস নিয়ে বলল জেসমিন। 'অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। সত্যি করে বল, কি করেছ তুমি?'

ট্রাউজারের ব্যাক পকেট থেকে ক্ষুরটা বের করে খুলল জুবের। আলো লেগে ঝিক করে উঠল ফলাটা। হঠাৎ ভয় পেয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল জেসমিনের, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

হেসে উঠল জুবের। 'দেখলে তো, ক্ষুরটা দেখেই তুমিও কেমন ভয় পেয়ে গেলে। এই-ই হয়। ধারাল কিছু দেখলেই মানুষের বুক ছঁ্যাৎ করে ওঠে।'

পাথর হয়ে গেছে জেসমিন। সারা শরীর অবশ। জুবেরকে ভয় করছে তার। এখন যদি হঠাৎ তার ওপর ক্ষুর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও? আরো এক পা পিছিয়ে গেল সে। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতরটা। 'কিন্তু ওরা যদি পুলিশের কাছে যায়?'

'বললাম তো, সব ঠিক করে ফেলেছি। ওরা আর আমাদের বিরক্ত করবে না।'

'তারমানে শুধু ভয় দেখাওনি। কি করেছ, জুবের? এত জোর দিয়ে কথাটা বলছ কিভাবে?'

'দেখ, জেসমিন, এ-ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন কর না আমাকে।' চোখ রাঙিয়ে বলল জুবের।

'ও।' ফিসফিস করে বলল জেসমিন। 'এবার বুঝি আমাকে ভয় দেখাবার পালা?'

সেই অর্থহীন হাসিটা জুবেরের মুখে স্থির হয়ে গেল। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল সে। 'ঠিক সময়েই করেছ প্রশ্নটা। আমাকে বিপদে ফেলতে পারে এমন কেউ নেই আর, তুমি ছাড়া।

পারভিন আর শফিক, ওদেরকে এখন আর আমি বিপদ বলে মনে করছি না। বিপদ হলে তুমি। ঠিক ওই সময়টায় তুমি যদি স্যুইটে ফিরে না আসতে, কিছুই জানতে পারতে না। আমার নিরাপত্তার জন্যেও তুমি একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে না। তোমার সাথে এই যে চটাচটি, মন কষাকষি, এসবও হত না।'

'পরিষ্কার করে বল, জুবের।' চাপা গলায় বলল জেসমিন। 'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

ক্ষুরের ফলাটা মুখের সামনে তুলে গভীর মনোযোগের সাথে সেটা দেখছে জুবের। চোখ না সরিয়েই বলল, 'তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। তোমাকে ভয় দেখাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। ভাল করেই জান আমাকে ধরিয়ে দিলে আমিও তোমাকে খুনে সহায়তা করার জন্যে ফাঁসাব। যে-কারণে প্রথমেই বাবাকে বা পুলিশকে আমার অপরাধের কথা বলনি, এখন শুধু সেই কারণেই নয়, আরো একটা কারণে আমাকে তুমি ধরিয়ে দিতে চাইবে না। তুমি জেল খাটতে চাও না। নাকি চাও, জেসমিন?' ক্ষুরের ফলা থেকে চোখ তুলে জেসমিনের দিকে তাকাল সে।

নিজের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে অসুবিধে হল না জেসমিনের। রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। জুবেরের সাথে বুঝেশুনে কথা বলা দরকার, সেটা আর মনে থাকল না। 'আমার ধারণাই ঠিক, তুমি একটা মানসিক রুগী। তুমি পাগল। তোমাকে পাগলা গারদে ভরে রাখা উচিত...'

'থামো।' চাপা গলায় গর্জে উঠল জুবের। 'এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমাকে পাগল বল।' হঠাৎ হাসল সে। 'জানি, গোলমাল মিটে গেলেই বাবাকে তুমি সব কথা বলে দেবে। বাবা আর তুমি পরামর্শ করে আমাকে কোন মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার

ব্যবস্থা করবে। মনে মনে এই রকম একটা প্ল্যান করে রেখেছ, তাই না? সেটি হচ্ছে না, জেসমিন। যদি ভেবে থাক, আমাকে ঘরের ভেতর আটকে রাখতে পারবে তাহলে মস্ত বোকামি করবে তুমি। মানসিক রুগী হিসেবে হাসপাতালে থাকার চেয়ে জেল খাটতে বা ফাঁসিতে ঝুলতেও রাজি আছি। হাসপাতালে যাবার আগে আমি পুলিশকে সব কথা বলব। তাতে অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, তোমাকে ফাঁসাতে পেরেছি।'

'এই রকম একটা জঘন্য অপরাধ করার পরও তুমি আশা কর তোমাকে আর সবার মতো স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে?' বিদ্রূপের সুরে বলল জেসমিন। 'আমাকে আমার এবং আমার স্বামীর নিরাপত্তার কথাও তো ভেবে দেখতে হবে। বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে ভয়ংকর হয়ে ওঠে, আবার সে কারো না কারো, একের পর এক, ঘাড় মটকাবেই। জেনেশুনে সে-সুযোগ কেউ কাউকে দেয়?'

মনের ভেতর থেকে কে যেন সতর্ক করে দিতে চাইল জুবেরকে। তার যুক্তিগুলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। '...তোমার নিরাপত্তার জন্যে একমাত্র হুমকি এখন এই জেসমিনই। ওকে পথ থেকে সরিয়ে দাও।...তোমরা দু'জন ছাড়া স্যুইটে কেউ নেই। এই-ই সুযোগ। তোমার বাবা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরছেন না।...বুঝতে পারছ না, জেসমিনকে বিশ্বাস করা যায় না।...কাজটা পানির মতো সোজা...ওকে শুধু অচেতন করতে হবে...তারপর পোশাক খুলে নিয়ে বাথটাবে শুইয়ে দাও... সবাই মনে করবে গোসল করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, মাথায় আঘাত লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তারপর বাথটাবে ডুবে গিয়ে মারা গেছে...যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন।...যাও!'

রিস্টওয়াচ দেখল জুবের। একটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। হাতে সময় যে নেই তা নয়…।

বলল, 'তোমার যত আজেবাজে চিন্তা, জেসমিন। ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছি বলে তুমি মনে করছ আমি অসুস্থ, আবার ওই জঘন্য কাজ করব,' চেহারা দেখে মনে হল জুবের অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তার গলার স্বরও করুণ হয়ে উঠল। 'তুমি বললে কোন ডাক্তারের কাছে আমি যেতে পারি। কিন্তু মানসিক হাসপাতালে যাবার কথা আমাকে বল না। জানি, আমাকে তোমরা বেশিদিন নিজেদের কাছে রাখতে চাও না। বেশ, তাই হবে। আমাকে তোমরা আলাদা কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিও।'

জুবেরের মধ্যে হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে মনটা নরম হয়ে গেল জেসমিনের। মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ হল না, জুবের তাকে বোকা বানাবার জন্যে ভান করছে। 'হ্যাঁ, এইটাই হল আসল কথা। তোমার চিকিৎসা দরকার। বেশ, হাসপাতালে তোমাকে যেতে হবে না। ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখালেই চলবে। তোমার ভালর জন্যেই…'

'সবাই তোমাকে পাগল বলে মনে করে।' জুবেরের মনের ভেতর থেকে আবার কে যেন কথা বলে উঠল, 'সাইকিয়াট্রিস্টও তোমাকে তাই ভাববে। কিন্তু জেসমিনকে যদি খতম করতে পার, কেউ কিছু জানতেই পারবে না, তোমাকেও পাগল ভাবতে যাবে না কেউ। লাউঞ্জের চারদিকে তাকাল জুবের। জেসমিনকে অজ্ঞান করার জন্যে একটা কিছু দরকার। কাজটা এখানে করবে, নাকি বেডরূমে? কাজটা যে করতেই হবে সে-ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে ও, মনে কোন দ্বিধা নেই। জেসমিন নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে।

মরতেই হবে তাকে। তবে, প্রথমে ওর মন থেকে ভয়টুকু দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। ও যদি সতর্ক হয়ে থাকে, কাজটা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল জুবের। 'কিন্তু আমার চিকিৎসার ব্যাপারটা তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না, ঠিক তো?' যা খুঁজছিল হঠাৎ সেটা দেখতে পেল সে। টেবিলের ওপর বড়সড় ভারি একটা পেপারওয়েট। কাজটা কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। প্রথম আঘাতটাই মোক্ষম হওয়া চাই। তা না হলে চিৎকার করার সুযোগ পাবে জেসমিন। বাইরের করিডোর থেকে লোক চলাচলের আওয়াজ আসছে···

টেবিলের দিকে এগোল জুবের। 'তোমার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট আছে নাকি? আজ রাতটা আমি মড়ার মতো ঘুমাতে চাই···'

কি মনে করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেসমিন। 'তোমার বাবার কাছে থাকতে পারে. ফিরে এলে চেয়ে দেখব। ঘুম পাচ্ছে আমি গেলাম···'জুবের টেবিলের কাছে পৌছুবার আগেই নাগালের বাইরে সরে গেল জেসমিন।

'এই,' পিছন থেকে ডাকল জুবের, 'তোমার ভ্যানিটি ব্যাগটা পড়ে রইল যে!'

ইতিমধ্যে নিজের বেডরূমের কাছে পৌছে গেছে জেসমিন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তার চোখে কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করল জুবের। তার মনের কথা টের পেয়ে গেছে নাকি?

'থাক ওখানে.' বেডরূমের দরজার কাছ থেকে বলল জেসমিন। ভেতরে ঢুকল তাড়াতাড়ি, জুবেরের চোখে চোখ রেখে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল জুবের। তারপর হাত বাড়িয়ে পেপারওয়েটটা ধরল। জিনিসটা ঠাণ্ডা হিম সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল তার। এগিয়ে গিয়ে বাইরে বেরুবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল, কিন্তু চাবিটা কীহোল থেকে বের করল না। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে বাবার আর জেসমিনের শোবার ঘর পাশাপাশি, মাঝখানে একটা দরজা…জেসমিন কি সেটা বন্ধ করে দিয়েছে? জানতে হয়…

নিঃশব্দ পায়ে বাবার বেডরুমের সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। খোলা দরজার ভেতর অন্ধকার। সাবধানে, পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল সে। লাউঞ্জের ক্ষীণ আলো ঢুকেছে ভেতরে, আসবাবগুলোকে এড়িয়ে পাশের কামরায় যাবার দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু ওদিক থেকে তালা দেয়া কিনা কে জানে। কবাটে কান ঠেকিয়ে কিছু শোনা যায় কিনা দেখল সে। পায়ের আওয়াজ আসছে। সম্ভবত পায়চারি করছে জেসমিন।

দরজার নব ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল জুবের। বেশ খানিকটা ঘুরে গেল, এবার নবটাকে নিজের দিকে টানতে শুরু করল। দরজার এক পাট এগিয়ে আসছে অনুভব করে হাতটা স্থির হয়ে গেল জুবেরের। বিজয়ের আনন্দে ভরে উঠল তার বুক। অদ্ভুত রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। এক পা পিছিয়ে এল সে। হাসিটা লেগে রয়েছে মুখে। ইচ্ছে হল একটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু সময় নষ্ট করা উচিত হবে না ভেবে ক্ষান্ত হল। রিস্টওয়াচ দেখল। দশ মিনিট বাকি একটা বাজতে। অস্থিরতা অনুভব করল সে। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। কাজটা এখুনি সেরে ফেলা দরকার। আবার এক পা এগোল দরজার দিকে। কবাট দুটো একটু ফাঁক করে

ফাঁকে একটা চোখ রাখল। বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে আছে পেপারওয়েটটা।

বাথরুমের দরজাটা খোলা। ভেতরে, উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে পোশাক খুলছে জেসমিন। মুহূর্তের জন্যে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেল জুবের। জেসমিনের আগুন ঝরা রূপ এতদিন পাগল করে এসেছে ওকে। কিন্তু সেই রূপের ভেতরটা কখনও দেখা হয়নি তার। আজ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখার সুযোগ পেয়েও সেটা উপভোগ করার ইচ্ছে জাগল না মনে, শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল।

পরক্ষণেই বাস্তবে ফিরে এল জুবের। দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব-টা হিসেব করে নিরাশ হল সে। এক ছুটে কাছে গিয়ে পৌছুবার আগেই সতর্ক হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে জেসমিন। তাকে দেখতে পেলেই সরে যাবার, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করবে। না, ঝুঁকি নেয়া চলবে না।

একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল জেসমিন। পানির কলটা আগেই ছেড়ে রেখেছিল, পানিতে ভরে গেছে বাথটাব। দরজার দিকে পিছন ফিরে বাথটাবে নামল সে। গলা পর্যন্ত ডুবে গেল। পা দুটো মেলে দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ার ভঙ্গিতে বসেছে।

সেই অর্থহীন হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল জুবেরের সারা মুখে। দরজার কবাট আরো ফাঁক করল সে। বেডরুমে ঢুকে নিঃশব্দ পায়ে এগোল। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে জেসমিন। কিছুই টের পায়নি এখনও। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজার সামনে থামল জুবের। বাঁ হাতের পেপারওয়েটটা ডান হাতে চলে এল। পা বাড়াল সে।

হোটেল প্লাজা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ-লাফ দিয়ে নিচে নামল গোলাম কিবরিয়া। প্লাজার ভেতরটা অন্ধকার দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। রেস্তোরাঁর দরজার কাছে দেখা হল সনাতনের সাথে।

'আসুন, এই দিকে…'পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল সনাতন ইন্সপেক্টরকে।

রেস্তোরাঁ পেরিয়ে হলঘরে এসে দাঁড়াল ওরা। কয়েকটা মোম-বাতি আর টর্চ জেলে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'ইলেকট্রিসিটির কি হল?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা,' বলল সনাতন। 'সব আলো এক সাথে নিভে গেছে। নতুন ফিউজ পরিয়েছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি। আমাদের মিস্ত্রি ওয়্যারিং পরীক্ষা করে দেখছে।'

'শফিকুর রহমান তাহলে মারা গেছে…?'

'হ্যাঁ। ওপরের একটা খুপরীর ভেতর গলায় ফাঁস লাগিয়ে…'

হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকা পারভিনের কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা দেখে থমকে গেল ইন্সপেক্টর। 'ও কি! ওখানে ওটা কে পড়ে রয়েছে?'

'ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না,' বলল সনাতন। 'আমার ধারণা, শফিক সাহেবের লাশ দেখে খুব ভয় পেয়ে যান আইরিন পারভিন, অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্যে সিঁড়িবেয়ে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছেন। দেখুন না, সিঁড়িটা একে-বারে খাড়া…'

হলঘরে ঢুকল সার্জেন সতীশ সরকার। 'এই যে, ইন্সপেক্টর, পৌঁছে গেছ দেখছি। এবার বোধহয় তোমার মাথার চুল পেকে

যাবে, কি বল ?'

ইন্সপেক্টর গম্ভীর। জবাবই দিল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সার্জেন. পারভিনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার কাজ শুরু করে দিল। মিনিট খানেক পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গোলাম কিবরিয়ার দিকে। বলল, 'ঘাড়টা ভেঙে গেছে। এই রকম একটা ভারি শরীর, খাড়া সিঁড়ি থেকে পড়লে ঘাড় তো ভাঙবেই...'

সনাতনের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'শফিকুর রহমান ?'

'দোতালায়.' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সনাতন। ইন্সপেক্টর তাকে অনুসরণ করল।

আলমিরার ভেতর ঢোকার সময় বলল সে, 'তার মানে. এখানেই গা ঢাকা দিয়েছিল।'

একজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, একপাশে সরে দাঁড়াল সে। খুপরীর ভেতর ঢুকল ওরা। লাশের ওপর টর্চের আলো ফেলল সনাতন। দরজার হাতলে লাল রেশমী রশিটা আটকে গলায় ফাঁস পরেছিল শফিক, দৃশ্যটা সেভাবেই সাজানো। রশিটার দিকে ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সনাতন। 'ওই যে রশিটা, ওটাই আমরা খুঁজছিলাম। ওর পকেট থেকে নীল পুঁতিও পাওয়া গেছে একটা। টেবিলের ওপর সযত্নে রাখা পুঁতিটা দেখাল সনাতন।

'আত্মহত্যার কারণ কিছু লিখে রেখে যায়নি ?'

'না। মদে ডুবে ছিল বললেও কম বলা হয়...সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়েছে...'

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল ইন্সপেক্টর। 'সানিয়াকে যে এ-ই খুন করেছে তাতে আর সন্দেহের বিশেষ কিছু নেই। অপরাধবোধ থেকে বাঁচার জন্যে প্রচুর মদ খেয়েছিল, তারপর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে

আত্মহত্যা।'

এই সময় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল।

'গুড.' বলল ইন্সপেক্টর। 'ফটো তোলার ব্যবস্থা কর, তারপর নিচে নামিয়ে আনো লাশ—'

'জ্বী,' বলল সনাতন।

'আর শোন, ওর হাতের ছাপ নিতে ভুলো না। কেসটা জলবৎ তরলং বলে মনে হলেও, প্রমাণগুলো মেলাতে হবে আমাদের। আগের পুঁতির গায়ে হাতের ছাপ আছে, সেই ছাপের সাথে ওর হাতের ছাপ মেলে কিনা দেখা দরকার।'

'জ্বী।'

সরকারী ফটোগ্রাফারকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন কনস্টেবল। আলমিরার ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল গোলাম কিবরিয়া। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। হাতের মুঠো খুলে একটা দশ পয়সা দেখাল সে। বলল, 'স্যার, এটার জন্যে সব আলো নিভে গিয়েছিল।' আঙুল তুলে সিঁড়ির মাথার পাশের কামরাটা দেখাল সে। 'ওই ঘরের হোল্ডারের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিল কেউ।' চলে গেল মিস্ত্রি।

একজন কনস্টেবলকে ডেকে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা তো গোল্ডেন ইন থেকে হৈ-চৈ শুনে এখানে এসেছিলে, তাই না? মহিলা সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার ফলে বোর্ডাররা চেঁচামেচি শুরু করে, আলোটা কি তারপর নিভে যায়?'

'জ্বী, হৈ-চৈ শুরু হবার দু'এক মিনিট পরে নিভে যায়।'

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাল ইন্সপেক্টরকে। 'তার মানে, কেউ পালাবার জন্যে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। ঠিক আছে তুমি যেতে পার।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সার্জেন দোতালায় উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আলমিরাটা দেখিয়ে তাকে বলল, 'ওখানে আরেকটা লাশ আছে।'

আলমিরার ভেতর ঢুকে গেল সার্জেন সতীশ। সেখান থেকে খুপরীর ভেতর। ইতিমধ্যে ফটো তোলা হয়ে গেছে, ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে আসা হয়েছে লাশ।

দশ মিনিট পর বিমূঢ় চেহারা নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সার্জেন। ইন্সপেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে কড়ে আঙুলের প্রথম গিটে বুড়ো আঙু-লের কিনারা ঠেকাল, তারপর দ্বিতীয় গিটে। বলল, 'দুটো জিনিস চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। এক, মিসেস পারভিনের পিঠে, কাঁধের ঠিক নিচেই খানিকটা জায়গা কালচে হয়ে আছে—পেছন থেকে খুব জোরে ধাক্কা দিলে এই রকম দাগ হতে পারে।'

'তার মানে বলতে চাইছ, আত্মহত্যা করেনি, শফিকের গলায় কেউ পরিয়ে দিয়েছে ফাঁসটা?'

'তা জানি না। মহিলার পিঠে ওই দাগটা দেখে যা মনে হয়েছে তোমাকে বললাম।'

'আর দু'নম্বর?'

'মনে আছে, বলেছিলাম, সানিয়া তার খুনীকে আঁচড়ে দিয়েছিল? তার আঙুলের নখের ভেতর খানিকটা চামড়া দেখতে পেয়েছিলাম বলেই কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, শফিকুর রহমা-নের শরীরের কোথাও কোন আঁচড়ের দাগ নেই।'

চটে উঠল ইন্সপেক্টর। 'তুমি ঠিক জান, সানিয়া তার খুনীকে আঁচড় দিয়েছিল?'

'ঠিক না জানলে কথাটা তোমাকে বলতাম?' পাল্টা ঝাঁঝ দেখিয়ে

বলল সার্জেন।

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ইন্সপেক্টরের। 'ভাল করে দেখেছ, শফিক সাহেবের শরীরে কোথাও কোন আঁচড়ের দাগ নেই?'

'নেই।'

সনাতনের দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'ফিঙ্গারপ্রিন্টের কি হল?'

'পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।'

সার্জেন সতীশ চলে যেতেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট বারান্দায় বেরিয়ে এল। গোলাম কিবরিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল সে, বলল, 'রেনবোর ত্রিশ নম্বর স্যুইটে পাওয়া পুঁতির গায়ে যে হাতের ছাপ রয়েছে তার সাথে শফিকুর রহমানের হাতের ছাপের কোন মিল নেই।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সিঁড়ির মাথার কামরাটা দেখিয়ে গোলাম কিবরিয়া বলল, 'ওই কামরার ইলেকট্রিক বালবের গায়ে হাতের ছাপ পাওয়া যায় কিনা দেখ। পাওয়া গেলে মেলাবার চেষ্টা কর।'

ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট চলে গেল। বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল ইন্সপেক্টর মিনিট দশেক পর উত্তেজিত ভাবে ফিরে এল এক্সপার্ট। বলল, 'ঠিক ধরেছেন, স্যার! বালবে পাওয়া ছাপের সাথে পুঁতিতে পাওয়া ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল গোলাম কিবরিয়া। লক্ষ্য করল, হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে তার। বলল, 'এর মানে, আমরা হেরে গেছি মনে করেছিলাম কেসটার সুরাহা করে ফেলেছি, আসলে ঘোড়ার ডিম।' গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। তারপর আবার বলল, 'তবে এইটুকু জানতে পেরেছি যে পুঁতি আর বালবে যার হাতের ছাপ

রয়েছে সেই আমাদের লোক, তাকেই আমরা খুঁজছি।' সনাতনের দিকে ফিরল সে। 'চলো হে, রেনবোয় ফিরতে চাই আমি।'

বার

বাথটাবে নেমে জুবেরের কথাই ভাবছিল জেসমিন। কথা বলার সময় হঠাৎ করে জুবেরের চেহারা বদলে যেতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল, জুবের বুঝি তার মুখ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সেজন্যেই ওকে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, সরে এসেছিল নিজের বেডরুমের কাছে। কোন ব্যাপারে মনে সন্দেহ দেখা দিলে সেটা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখা একটা স্বভাব আছে তার। জুবের সম্পর্কে তার সন্দেহটাও আজ সে যাচাই করে নিতে চায়। সেজন্যেই পাশের ছুটো বেডরুমের মাঝের দরজায় তালা দেয়নি সে। দেখতে চায়, তার মুখ বন্ধ করার জন্যে কতটা বেপরোয়া হতে পারে জুবের। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় কিনা। অবশ্য, নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে। পোশাক খোলার আগেই পিস্তলটা রেখে গিয়েছিল বাথরুমে।

তার সন্দেহটা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, জুবের যদি সত্যি তাকে খুন করার চেষ্টা করে, আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালাতেও দ্বিধা করবে না সে। তারপর সব কথা জানিয়ে দেবে ওর বাবাকে। তাতে অবশ্য

পুলিশী ঝামেলা এড়ানো যাবে না—নাই গেল।

হঠাৎ চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল পিছনে খুট করে একটা আওয়াজ হওয়ায়। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জেসমিন। ছঁ্যাৎ করে উঠল বুক। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জুবের। বাঁ হাতে ধরে আছে দরজার নব, ডান হাতটা পিছন দিকে লুকানো, ঘাড়টা একদিকে সামান্য একটু কাত্ করা।

কঠিন সুরে জানতে চাইল জেসমিন, 'তুমি? তুমি এখানে কেন?'

জিভের ডগা বের করে নিচের ঠোঁটের ওপরটা ভিজেয়ে নিল জুবের। হাসি নেই মুখে, নিচু গলায় আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, জেসমিন। বিশ্বাস কর, কোন কষ্ট হবে না, একটুও ব্যথা লাগবে না। তাড়াতাড়ি সারব আমি। নড়াচড়া কর না—স্থির হয়ে থাক।'

জেসমিনের বুকের ভেতর লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। ভুলটা বুঝতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। এই রকম একটা ঝুঁকি নিতে যাওয়া চরম বোকামি হয়ে গেছে। জুবেরের চোখের চারপাশে কুঁচকে গেছে চামড়া, আশ্চর্য লম্বা দেখাচ্ছে মুখটা যেন অচেনা একজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

'বেরো! বেরো এখান থেকে!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জেসমিন। 'শয়তান, চরিত্রহীন, বদমাশ—আসছে তোর বাবা, সব বলে দেব ওকে। বেরো, বেরো বলছি…'

আবার সেই অর্থহীন হাসিটা ফুটে উঠল জুবেরের মুখে। 'বাবাকে বলে দেবে? কিন্তু সে-সুযোগ তোমায় দিচ্ছে কে?' চৌকাঠ টপকে বাথরুমে ঢুকল সে। পিছন থেকে সামনে নিয়ে এল ডান হাতটা। হাতে পেপারওয়েট দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠল জেসমিনের চোখ

জোড়া।

'খবরদার, জুবের!' চেঁচিয়ে উঠল জেসমিন। 'আর এক পা-ও এগিয়ো না বলছি!' কিন্তু জুবের আবার পা তুলছে দেখে বাথটাবের ওদিক থেকে পিস্তলটা তুলে নিল সে। 'দেখছ, আমার হাতে কি এটা? ভাল চাও তো বেরোও, তা না হলে গুলি করব...'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জুবের। হতচকিত দেখাল তাকে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে মাত্র। আবার এগোতে শুরু করল সে।

'না!' আতংকে বাথটাবের গায়ে সেঁটে গেল জেসমিন। 'চলে যাও। জুবের...এগিয়ো না বলছি...' জুবেরের দিকে পিস্তলটা তাক করল সে, কিন্তু হাতটা থরথর করে কাঁপছে। আবার সেই অর্থহীন হাসিটা ফুটে উঠতে দেখল সে জুবেরের মুখে।

জেসমিনের নাগালের মধ্যে চলে এল জুবের। পিস্তলটা তার পেটের দিকে তাক করা রয়েছে দেখেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে সে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা হিস-হিস শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না জেসমিন। বুঝতে পারল, আর সময় নেই, এখুনি গুলি করতে হবে। কিন্তু হাতটা এভাবে কাঁপলে গুলি লাগবে না...তা না লাগুক, অন্তত ভয় দেখাবার জন্যে গুলি করতে হবে... জুবেরের উরু লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল সে।

ঠিক সেই সময়ে জেসমিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুবের।

ট্রিগার টিপেই মারাত্মক ভুলটা বুঝতে পারল জেসমিন। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করা হয়নি। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে তার মাথার ওপর নেমে এল জুবেরের হাতটা। মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল জেসমিন, পারল না।

কপালের এক ধারে পেপারওয়েটের প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে সাথে

সাথে জ্ঞান হারাল জেসমিন।

সিগারেট ধরাবার সময় লক্ষ্য করল জুবের, হাত দুটো একটুও কাঁপছে না তার। পেপারওয়েটটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে সে। এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিল পিস্তলটা, রেখে দিল ট্রাউজারের পকেটে। সম্পূর্ণ শান্ত, অবিচল লাগছে নিজেকে। ঝুঁকে পড়ে জেসমিনের ফোলা কপালটা পরীক্ষা করল। তারপর ওর শরীর থেকে তুলে নিল তোয়ালেটা।

এখন শুধু একটাই ভাবনা তার—জেসমিন মারা গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। ওর অপরাধের কথা…না-না, অপরাধ নয়, অ্যাডভেঞ্চারের কথা কেউ জানতে পারবে না। জেসমিন মারা গেলেই সম্পূর্ণ নিরাপদ ও।

বাথটাবের কাছ থেকে পিছিয়ে আসবে, হঠাৎ নড়ে উঠল জেসমিন। দ্রুত তার পায়ের দিকে চলে এল জুবের। পানিতে হাত ডুবিয়ে জেসমিনের পায়ের গোড়ালি দুটো শক্ত করে চেপে ধরল। চাপা একটা হাসি স্থির হয়ে আছে ঠোঁটের এক কোণে, আরেক কোণে ঝুলছে সিগারেট। গোড়ালি ধরে টানতে শুরু করল সে। ধীরে ধীরে পানিতে নেমে এল জেসমিনের মুখ। তারপর ডুবে গেল পানির নিচে। দুই পায়ে টান পড়ছে অনুভব করে আরো জোরে চেপে ধরল জুবের। পা ছুঁড়ছে জেসমিন। জুবেরের দুই হাতের পেশী ফুলে উঠল।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল জুবেরের বুক। স্যুইটের ভেতর চলাফেরার আওয়াজ। নাকি মনের ভুল? উঁহু, ওই তো আবার। কে

যেন চেয়ার সরাল। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল তার। কে হতে পারে? বাবা? ঢোক গিলল সে। বাথটাবের দিকে তাকিয়ে দেখল, পানির নিচ থেকে আর বুদবুদ উঠছে না। জেসমিনের পা দুটোও স্থির হয়ে গেছে। দ্রুত একটা হিসেব করল জুবের। কমপক্ষে তিন মিনিট ধরে পানির নিচে রয়েছে জেসমিন। এরপরও কি আর বেঁচে থাকা সম্ভব? নিশ্চয়ই মরে গেছে…

'জেসমিন? কি হল তোমার?' বাবার গলা শুনে ধ্বক করে উঠল জুবেরের বুকের ভেতরটা। 'দরজা খোল। সারারাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

দ্রুত জেসমিনের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল জুবের। পানির নিচে হাত নামিয়ে দিয়ে জেসমিনের মাথা তুলে ফেলল। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। 'বাঁচাও। বাঁচাও। কে আছ, জলদি এস।' দারুণ, দারুণ অভিনয়।—নিজের প্রশংসা না করে পারল না সে। চিনতেই পারছে না নিজের কণ্ঠস্বর। কান্না এবং ভয় মেশানো নিখুঁত আর্তনাদ।

বেডরূমে ভারি পায়ের আওয়াজ, ছুটে আসছে কে যেন। ঘাড় ফেরাতেই দরজায় বাবাকে দেখতে পেল জুবের। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় সিটকে আছে সে, কিন্তু এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাবাকে দ্রুত করণীয় স্থির করতে দেখে অবাক না হয়ে পারল না। টি আলমকে এতটুকু বিচলিত বলে মনে হল না। কয়েক সেকেণ্ড দোর গোড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ছেলেকে। টলমল করতে করতে সরে গেল জুবের। পাঁজাকোলা করে স্ত্রীকে বাথটাব থেকে তুললেন টি আলম। তাকে নিয়ে

ছুটে চলে এলেন বেডরুমে।

বেসিনের সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। একটু নিচু হয়ে হড় হড় করে বমি করল। দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে বেসিনের কিনারা। সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে।

কঠিন গলায় ডাকলেন বাবা, 'এদিকে আয়।'

কাঁপা হাতে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল জুবের। ঘুরে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে ঢুকল বেডরুমে। দেখল, মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে জেসমিন। স্ত্রীর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন টি আলম। থমথম করছে মুখের চেহারা। দ্রুত হাতে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীর পিঠে চাপড় দিচ্ছেন তিনি, প্রতি-বারই খানিকটা করে পানি বেরিয়ে আসছে গলার ভেতর থেকে।

'ডাক্তার, হোটেলের ডাক্তারকে বল আমি ডাকছি।' ছেলের দিকে না তাকিয়েই বললেন তিনি। 'কুইক।'

লাউঞ্জে পালিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল জুবের। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফোনের রিসিভার তুলল সে। অপারেটরকে বলল, 'সাতাশ নম্বর স্যুইটে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। এক্ষুনি ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিন।' অপারেটরকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল। তারপর গুটি গুটি পায়ে ফিরে এল বেডরুমে।

জেসমিনকে নিয়ে ব্যস্ত বাবা, মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছিল বল।'

'ঠিক জানি না,' খুব নিচু গলায়, যেন বিমূঢ় ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ধীরে ধীরে বলল জুবের। 'বোধহয় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায়, অথবা পা পিছলে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে

ফেলেছিল। ছলাৎ করে একটা আওয়াজ হতে ছুটে আসি আমি, এসে দেখি বাথটাবে ডুবে গেছে।'

'ডাক্তার, ডাক্তার আসছে না কেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন টি আলম। 'সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলি যে? আমার কথা বলে তাকে টেনে নিয়ে আয়।'

আবার লাউঞ্জে পালিয়ে এল জুবের। দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, এই সময় সেটা খুলে গেল। জুবের দেখল, মেঝেতে পড়ে রয়েছে দরজার চাবিটা। তার মানে, কী-হোল থেকে চাবিটা ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছেন বাবা। লাউঞ্জে ঢুকল ডাক্তার, জুবেরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'ওদিকে,' বেডরুমটা ডাক্তারকে দেখিয়ে দিল জুবের। ডাক্তার সেদিকে পা বাড়াতেই ধপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়। মনের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। জেসমিন কি মরেনি? না মরার কি কারণ থাকতে পারে? অতক্ষণ পানির নিচে থাকার পর বাঁচে কেউ? কিন্তু যদি না মরে···না-না, এসব কি ভাবছে সে। জেসমিনকে মরতেই হবে।

'হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে···'বাবার গলা ভেসে আসছে, '·· বাথটাবে ডুবে গিয়েছিল।···হ্যাঁ, তবে প্রায় সবটুকু পানি বের করে ফেলেছি আমি···হ্যাঁ, দেখুন···'

তারপর যন্ত্রণাকর নিস্তব্ধতা। লাউঞ্জের ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে সরে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে এল জুবেরের। বসে থাকতে পারল না, সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করল। বিড় বিড় করছে আপন মনে। মরেছে, না মরেনি? মরেছে, না মরেনি···। তারপর থমকে দাঁড়াল সে। ডাক্তারের গলা আসছে।

'চিন্তার কিছু নেই, মিসেস সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে আঘাতটা অস্বাভাবিক জোরে লেগেছে। দু'চার ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না। নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছেন উনি…আপনি যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার কথা না ভাবতেন…'

'ওসব কথা থাক,' দ্রুত বললেন টি আলম। 'ফিরে গিয়ে এখুনি দুজন নার্সকে পাঠিয়ে দিন। আর যা যা দরকার, সব ব্যবস্থা করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না। ওকে আবার সুস্থ করে তোলার জন্যে আমার সর্বস্ব যদি দিতে হয়, তাতেও আমি রাজি। কি কি লাগবে আপনি বরং তার একটা তালিকা তৈরি করে নিন…'

আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল জুবের। তার মানে, ব্যাপারটা কেঁচে গেল। হেরে গেল সে। অবশ্য, গোটা ব্যাপারটাই ছিল জুয়া খেলার মতো, আগাগোড়া প্রথম থেকেই ঝুঁকি ছিল। প্রথম দিকে প্রসন্নই ছিল ভাগ্যটা। শফিক আর পারভিন, এদের বেলায় তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। ইস্, বাবা যদি আর এক মিনিট পর আসতেন…।

কি হবে এখন? ডাক্তার বলল, জেসমিনের জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু সন্দেহ নেই, জ্ঞান ফিরলেই সব কথা বাবাকে বলে দেবে সে। তার মানে, বাঁচতে হলে এখুনি ওর পালানো দরকার।

হঠাৎ চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জুবেরের। সেটাই বা মন্দ কি। এতদিন ধরে ঠিক এই রকম কিছু একটাই তো চাইছিল সে। পুলিশ তাকে তাড়া করবে, সে পালিয়ে বেড়াবে। কি মজা। সত্যি-কার অ্যাডভেঞ্চার আছে এর মধ্যে। নিজের সাহস, বুদ্ধি, কৌশল ইত্যাদি খাটিয়ে পুলিশকে ফাঁকি দেয়া, তাদেরকে বোকা বানানো—সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর ব্যাপার হবে।

টাকা। পালাতে হলে পকেটে কিছু টাকা চাই। টাকা ছাড়া আর কি দরকার? একটা অস্ত্র? ট্রাউজারের ব্যাক পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটার স্পর্শ নিল জুবের। আছে। এখন শুধু টাকা হলেই কেটে পড়তে পারে সে।

মাথা নিচু করে চিন্তা করছে, জুবের, এই সময় বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন টি আলম। চমকে উঠে মুখ তুলল জুবের। দেখল, বাবার কপালে চিক চিক করছে ঘাম। কিন্তু চেহারায় আগের সেই উদ্বেগ বা রগচটা ভাব নেই। 'তোর মা খুব জোর বেঁচে গেছে, বুঝলি।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'কিন্তু তুই এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা ঘরে গিয়ে ঘুমো। ওয়র্কশপের একটা ছবিও তো দেখলি না··· তোর কি হবে। যা, নিজের ঘরে যা—কাল সকালে যেন নবাবজাদার মতো বেলা বারোটায় না ওঠা হয়।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল জুবের। দেখা হলেই সেই গালমন্দ। জেসমিনকে পানি থেকে সময় মতো তুলল বলে একটু প্রশংসাও নয়। কিন্তু যদি জানতেন যে জেসমিনের ওই অবস্থার জন্যে সে-ই দায়ী, তাহলে? নিশ্চয়ই গুলি করতেন।

বাবার বেডরুমের পাশ ঘেঁষে এগোল জুবের। ঠিক এই সময় লাউঞ্জে ঢুকল ডাক্তার, সাথে দু'জন নার্স, বাবা তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সুযোগটা ছাড়ল না জুবের। ছুট করে বাবার বেডরুমে ঢুকে পড়ল সে। ভাগ্যটা আবার সহায়তা করতে শুরু করেছে, টেবি-লের ওপর মানিব্যাগ আর দেরাজের চাবি পড়ে থাকতে দেখে ভাবল। ব্যাগে একশো টাকার মাত্র ছয়টা নোট রয়েছে, ওতে কাজ হবে না। চাবির গোছা তুলে নিয়ে দেরাজ খুলল জুবের। দ্রুত হাতে অনেকগুলো

নতুন বাণ্ডিলের একটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। দেরাজে তালা দিয়ে আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে এল লাউঞ্জে। ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়ে বাবা জেসমিনের বেডরুমে ঢুকেছেন। নিজের ঘরে ফিরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল জুবের।

দ্রুত হাতে একটা স্যুটকেসে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস-পত্র ভরে নিল সে। এই মুহূর্ত থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন শুরু হল তার। সকাল হতে না হতে পুলিশ তার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠাবে। সেজন্যে চিন্তিত নয় সে। সাথে টাকা আছে। বুকে বল আছে। মাথায় বুদ্ধি আছে। আর আত্মরক্ষার জন্যে পকেটে আছে একটা পিস্তল। আর কি চাই?

পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কবাট খুলল। বাথরুম থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে। বাবা বোধহয় গোসল করছেন। লাউঞ্জ পেরিয়ে এল সে। একবার ইচ্ছে হল, ঝুঁকি নিয়ে জেসমিনের বেডরুমে যায়, শেষ করে দিয়ে আসে। যাবে বলে ঘুরতেও গেল, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা দরজার কবাট খোলার আওয়াজ শুনে বুঝল, বাবা গোসল সেরে বেডরুমে ঢুকলেন। আবার তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল করিডোরে।

নিচের লবিতে এখনও লোকজন রয়েছে। সদ্য ছবি দেখে ফিরে এসে ছবির শিল্পগুণ নিয়ে জোর তর্ক চলেছে। তাদের মধ্যে বাবার সেক্রেটারী-ম্যানেজার নুরুল হককেও দেখল জুবের। দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। ছটো বাজতে বিশ মিনিট বাকি। হঠাৎ মুখটা শুকিয়ে গেল তার। যা ভয় করেছিল, তাই। সোজা তার দিকেই এগিয়ে আসছে নুরুল হক।

জুবেরের পথ রোধ করে দাঁড়াল নুরুল হক। 'জুবের তুমি! এত-

রাতে। কোথায় যাচ্ছ?'

নিঃশব্দে পাশ কাটাল জুবের নুরুল হককে। একটাও কথা বলল না। হন হন করে বেরিয়ে এল রেনবো থেকে। পিছন থেকে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল নুরুল হক। বিড় বিড় করছে, 'ছেলেটা পাগল নাকি।'

নোটবুক বন্ধ করে এক ধারে সরিয়ে রাখল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। প্রকাণ্ড শরীরটা নড়ে ওঠায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল চেয়ারটা। ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল সহকারী সনাতনের দিকে।

চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসে আছে সনাতন। সারাটা দিন শরীরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে, আর পারছে না সে। কিন্তু জানে, গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত ইন্সপেক্টর নিজেও বিশ্রামের নাম মুখে আনবে না, তাকেও বিশ্রাম নিতে দেবে না।

সিগারেট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল গোলাম কিবরিয়া। 'শফিকুর রহমান সানিয়াকে যদি নাই খুন করে থাকে,' বলল সে, 'সন্দেহের তালিকায় তাহলে আর কে আছে? আর মাত্র একজনকে দেখা যাচ্ছে। জুবের আলম।'

সোজা হয়ে বসল সনাতন। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ওই তো বয়স, ওর পক্ষে কি একটা মেয়েকে খুন করা…' কথা শেষ না করে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে।…'এই বয়সে একটা মেয়েকে খুন করার কারণই বা কি হতে পারে?' তারপর ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'ওকে আপনার সন্দেহ হল কেন?'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল গোলাম কিবরিয়া। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'সানিয়ার সাথে জুবের আলমই শেষবার কথা বলে। রেনবোয় ঢুকে সানিয়া তিন তালায় উঠে যায়, তখন জুবের আলম তিন তালাতেই ছিল। কাজটা তারই কিনা জানি না, কিন্তু কাজটা করার সুযোগ তার পুরোপুরি ছিল।'

'কিন্তু তখন তো মিসেস টি আলমও তিন তালায় ছিলেন।'

'সেটাই আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে।' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গোলাম কিবরিয়া। 'আর কে? আর কার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব? কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একজন লোক সানিয়াকে খুন করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। আরেকটা ব্যাপার.' সহকারীর দিকে তাকাল সে, 'এখন আমার মনে হচ্ছে, ত্রিশ নম্বর স্যুইটে খুন করা হয়নি সানিয়াকে। ওটা সাজানো ব্যাপার, আমাদেরকে ডাইভার্ট করার একটা অপচেষ্টা মাত্র। এর আগেও এ-ধরনের একটা অপচেষ্টা চালানো হয়েছে—বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল, শফিকুর রহমানই খুন করেছে সানিয়াকে।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল সনাতনকে। 'এখন কি করা উচিত বলে মনে করেন?'

সোজা হয়ে বসল গোলাম কিবরিয়া। 'সকাল থেকে তিন তালার করিডোরে কে পাহারায় ছিল? কনস্টেবল এনাম না?'

'জী।'

'তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। আর, রশিদকে দরকার আমার।'

অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সনাতন। অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে নোটবুকটা আবার খুলল গোলাম কিবরিয়া। তার প্রশ্নের

উত্তরে জুবের আলম যা বলেছিল, সেটা লিখে রেখেছে। সেই লেখা-টার ওপর চোখ বুলাল আবার। জুবের বলেছিল, 'হার সানিয়ার গলায় দেখেছি, আমি কি তাই বলেছিলাম? কথা বলার সময় ওর হাতব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা, বালির ওপর থেকে তুলে সেটা আমি ওর হাতে দিই।'

জুবের আলমের প্রতি সন্দেহের ভিতটা একটু কেঁপে গেল। কিন্তু কথাটা যদি মিথ্যে হয়?

দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে অফিস কামরায় ফিরে এল সনাতন। রিস্টওয়াচ দেখল গোলাম কিবরিয়া। রাত একটা। কনস্টেবল এনামের দিকে তাকাল সে। বলল, 'টি আলমের ছেলে জুবের আলম-কে চেন, মানে দেখেছ?'

'জী, স্যার।'

'তিন তালায় পাহারা দেয়ার সময় স্যুইট থেকে বেরুতে বা স্যুইটে ঢুকতে দেখেছ তাকে?'

'জী, স্যার, দেখেছি,' বলল এনাম। 'আজ সকালে, এই দশটার দিকে, তিন তালায় উঠে ত্রিশ নম্বর স্যুইটে গিয়েছিলেন তিনি।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের। 'ত্রিশ নম্বর স্যুইটে?'

'জী, স্যার। জুবের সাহেবের বোধহয় কোন বন্ধু-বান্ধব থাকেন ত্রিশ নম্বর স্যুইটে। একটু পরই বেরিয়ে আসেন তিনি। তারপর নিজেদের স্যুইট থেকে সাঁতারের পোশাক নিয়ে নেমে যান।'

সিগারেট ধরাল ইন্সপেক্টর। সনাতনের দিকে একবার তাকাল আড়চোখে। তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সনাতন। 'ঠিক আছে, তুমি যেতে পার,' এনামকে বিদায় করে দিল গোলাম কিবরিয়া। তাকাল রশিদ কনস্টেবলের দিকে। 'তুমিও তো জুবের

আলমকে চেন, তাই না?'

'না, স্যার, চিনি না।'

জুবেরের চেহারার বর্ণনা দিল সনাতন। ইন্সপেক্টর জানতে চাইল, 'এই চেহারার কাউকে ঢুকতে দেখেছ হোটেল প্লাজায়?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রশিদ। 'না, স্যার।'

রশিদকে বিদায় করে দিল গোলাম কিবরিয়া। তারপর তাকাল সনাতনের দিকে। 'কি বুঝলে?'

'বুঝলাম, অন্ততঃ ত্রিশ নম্বর স্যুইটে পুঁতিটা রেখে আসার আর পর্দার রশিটা সরাবার সুযোগ পেয়েছিল জুবের আলম। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে, আমরা মিছেই সময় নষ্ট করছি। সানিয়া যখন খুন হয় তখন জুবের আলম তাদের স্যুইটে একা ছিল না। তার সাথে তার সৎ মাও ছিলেন। নিশ্চয়ই ওরা দু'জন মিলে সানিয়াকে খুন করেনি? আমার মনে হয়...'

হঠাৎ হাত নেড়ে সহকারীকে বাধা দিল ইন্সপেক্টর। উত্তেজিত মনে হল তাকে। ঝট করে ফোনের দিকে তাকাল সে। তারপর আবার ফিরল সনাতনের দিকে। 'এখানে আসার পর জুবের আলম এক জায়গায় ফোন করেছিল। রিসিভারে তার হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। একটা নির্দিষ্ট ছাপ খুঁজছি আমরা, তাই না? কুইক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে ধরে নিয়ে এস।'

ইন্সপেক্টরকে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে ঝড়ের বেগে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সনাতন। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল গোলাম কিবরিয়া। চোখে ঘুম, শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মাথার ভেতরটা সজাগ।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট প্লাজা হোটেলে ব্যস্ত ছিল, তাকে নিয়ে

সনাতন যখন ফিরল তখন রাত দুটো বেজে গেছে। ইন্সপেক্টরের নির্দেশে কাজ শুরু করে দিল এক্সপার্ট। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নিল সে। তারপরই উল্লাসে প্রায় নেচে উঠল সে। 'ঠিক ধরেছেন, স্যার। পরিষ্কার ছাপ রয়েছে রিসিভারে। এই হাতের ছাপই পাওয়া গেছে প্লাজার বালবে আর এই হোটেলের ত্রিশ নম্বর স্যুইটে পাওয়া পুঁতিতে। একই লোকের তিনটে ছাপ।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকল গোলাম কিবরিয়া। তারপর দশাসই শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করল। বলল, 'তাহলে জুবের আলমের সাথে কথা বলতে হয়,' পায়চারী থামিয়ে তাকাল সনাতনের দিকে। 'তুমি দারোয়ানকে জিজ্ঞেস কর, স্যুইটে তিনি আছেন কিনা। থাকলে, তাকে খবর দেবার কোন দরকার নেই, আমরাই ওপরে যাব।'

বেরিয়ে গেল সনাতন, ফিরে এল একটু পরই। 'একটার আগেই আলম পরিবারের সবাই ফিরে এসেছে, তারপর কাউকে আর বাইরে বেরুতে দেখেনি দারোয়ান।'

'চল তাহলে। ওর হাতে আঁচড়ের দাগ আছে কিনা দেখে আসা যাক।' একটু থেমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের দিকে তাকাল গোলাম কিবরিয়া। 'তুমিও এস। ওর হাতের ছাপ নিতে হবে।'

অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ইন্সপেক্টর। সহকারীকে বলল, 'সাতাশ নম্বর স্যুইটের দরজার সামনে চুপচাপ অপেক্ষা কর তুমি। একটু কৌশল করে ধরতে হবে ওকে।' ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল সনাতন। দ্রুত পায়ে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর।

'জুবের আলমকে ফোন করে বলুন, আমি তার সাথে কথা বল-তে চাই,' কেরাণীকে বলল সে।

'এতরাতে, ইন্সপেক্টর? উনি বোধহয় ঘুমিয়ে...'

'যা বলছি করুন।'

ইন্সপেক্টরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখে কেরাণী আর কথা বাড়াল না। রিসিভার তুলে ডায়াল করল সাতাশ নম্বর স্যুইটের নাম্বারে। কয়েক সেকেণ্ড পর কান থেকে রিসিভার নামিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুবের আলম স্যুইটে নেই।'

'নেই।'

'টি আলম সাহেব তো তাই বলছেন।'

কেরাণীর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'মিঃ টি আলম?'

'বলছি।' চরম বিরক্তির সাথে বললেন টি আলম। 'কি ব্যাপার?'

'আমি কক্সবাজার থানার ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। সানিয়া মার্ডার কেসের তদন্ত করছি। অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'শুয়ে পড়েছিলাম...ঠিক আছে, চলে আসুন। কিন্তু খুব বেশি সময় আপনাকে আমি দিতে পারব বলে মনে হয় না।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে দারোয়ানের কাছে এল ইন্সপেক্টর। 'তুমি বলেছ, জুবের আলম একটার দিকে ফিরে আসার পর হোটেল থেকে আর বের হয়নি?'

'জী, স্যার—মানে, বেরুতে দেখিনি।'

'কে? জুবের?' দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে ওদের কথা

শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল টি আলমের ম্যানেজার নুরুল হক। 'সে তো বেরিয়ে গেছে। হাতে একটা ব্যাগ দেখলাম, বোধহয় মাছ ধরতে গেছে। ওর তো যত সব বিদঘুটে কাজ। কেন বলুন তো?'

'তেমন কিছু নয়,' বলল ইন্সপেক্টর, 'সামান্য একটা ব্যাপার। ঠিক আছে।' নুরুল হক চলে যেতে সিঁড়ির দিকে এগোল সে।

তিন তলার করিডোরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে সনাতন। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। ইন্সপেক্টরকে সিঁড়ির মাথায় দেখে দু জনেই এগিয়ে এল।

'জুবের আলম স্যুইটে নেই,' বলল ইন্সপেক্টর। 'বোধহয় মাছ ধরতে গেছে।'

'লোক পাঠিয়ে ধরে আনার ব্যবস্থা করি?' জানতে চাইল সনাতন।

'এখুনি নয়। তার আগে আলম সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই। তোমরা যেয়ো না, এখানেই অপেক্ষা কর। দরকার হলে ডাকতে পারি।' বলে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর, সাতাশ নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়িয়ে নক করল।

দরজা খুলে দিলেন টি আলম। সরে গেলেন এক পাশে, বললেন, 'আপনিই ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া?'

'জী। আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিঃ আলম...'

'ঠিক আছে, দুঃখ প্রকাশ পরে করলেও চলবে, আগে ভেতরে ঢুকুন।' ইন্সপেক্টর ভেতরে ঢুকল। 'কি ব্যাপার বলুন দেখি?'

'আমি আসলে মিঃ জুবের আলমকে খুঁজছি। তিনি বোধহয়...'

'ওর মন ভাল নেই, তাই বোধহয় সাগরের দিকে একটু বেড়াতে

গেছে। এখানে হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে কিনা।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?' চোখ দুটো সতর্ক হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের।

'হ্যাঁ—মানে, আমার স্ত্রী হঠাৎ বাথটাবে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন, আর একটু হলে মারাই যাচ্ছিলেন···ঘটনাটা দেখে আমার ছেলে একটু ঘাবড়ে গেছে আর কি।'

'ও,' বলল ইন্সপেক্টর। 'তা মিসেস আলম এখন ভাল আছেন তো?' লাউঞ্জের চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানতে চাইল সে।

'আছেন,' স্লিপিং গাউনের পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরালেন টি আলম। কিন্তু ইন্সপেক্টরকে অফার করলেন না। ইন্সপেক্টর লক্ষ্য করল, বসতে বলাও হল না তাকে। 'এবার বলুন,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ কাজের কথায় এলেন তিনি, 'কি করেছে আমার ছেলে? হঠাৎ তাকে এত খোঁজাখুঁজি কেন?'

'ওই সানিয়া মার্ডার কেস সম্পর্কেই দু'একটা প্রশ্ন করার ছিল তাকে।'

'সানিয়া মার্ডার কেস সম্পর্কে আপনি আমার ছেলেকে প্রশ্ন করতে চান?' যতটা না বিস্মিত হয়েছেন টি আলম তার চেয়ে বেশি রাগ হয়েছে তাঁর। 'কেন? কি মনে করে?'

'কিছু একটা মনে করে তো বটেই, মিঃ টি আলম,' ইচ্ছে করেই একটু বেসুরো গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'থাক, তিনি যখন স্যুইটে নেই···'

'আই য়্যাম সরি···' দ্রুত বললেন টি আলম। 'বসুন, ইন্সপেক্টর! কিছু মনে করবেন না, সাংঘাতিক ক্লান্ত কিনা, তাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। বসুন···'

এগিয়ে গিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসল ইন্সপেক্টর। 'ব্যাপারটা হল, সানিয়া খুন হবার আগে মিঃ জুবের আলমই তার সাথে

শেষবার কথা বলেন। আমরা…'

'আচ্ছা? ও যে সানিয়াকে চিনত তা-ই আমার জানা ছিল না। কিন্তু…মানে, এই খুনের সাথে আমার ছেলের সম্পর্ক কি?'

চিন্তা-ভাবনা করে, সতর্কতার সাথে উত্তর দিল গোলাম কিবরিয়া, 'মিঃ জুবের আজ সকালে একটা জবানবন্দী দিয়েছেন, কিন্তু সেটা ঠিক আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের সামনাসামনি একটা আরাম কেদারায় বসলেন টি আলম। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরের দিকে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল ইন্সপেক্টর। নিজের লাইটার বের করে ধরাল সেটা। লাইটারটা পকেটে ভরে রাখতে গেল, হঠাৎ সেটা ঘামে ভেজা হাত ফসকে চেয়ারের মোটা গদি আর চওড়া হাতলের ফাঁকে আটকে গেল।

'কেন?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলেন টি আলম। 'আমার ছেলের জবানবন্দী আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি কেন?

টি আলমের দিকে চোখ রেখেই লাইটারটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল ইন্সপেক্টর। আঙুলে কিসের যেন স্পর্শ পেল সে. ছোঁয়া লেগে গদি আর চেয়ারের হাতলের ফাঁক গলে নিচে পড়ে গেল সেটা। এক পাশে ঝুঁকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চোখের সামনে আনল জিনিসটা। সাথে সাথে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। অবাক বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল সে হাতব্যাগটার দিকে। ব্যাগটা ছোট্ট, একটু লম্বাটে। গায়ের ওপর, একধারে সোনালি হরফে লেখা রয়েছে—'ইফফাৎ সানিয়া'। সানিয়ার এজেন্ট মাহবুব হোসেনের কথা মনে পড়ে গেল তার। এই হাতব্যাগটা সে ই

সানিয়াকে উপহার দিয়েছিল।

'কি ব্যাপার?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইলেন টি আলম। 'কি ওটা?'

'সানিয়ার হাতব্যাগ,' চোখ তুলে, যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'এটা এখানে পাওয়ায় এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে সানিয়াকে এখানেই খুন করা হয়েছে।'

'হোয়াট।' স্থির পাথর হয়ে গেলেন টি আলম। 'আপনার কি মাথা খারাপ হল! এখানে? এই স্যুইটে? ওহ্, নো! দ্যাটস ইম্পসিবল!'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গোলাম কিবরিয়া। 'আমি দুঃখিত মিঃ আলম। কিন্তু খুনটা যে এখানেই হয়েছে তা আমরা প্রমাণ করতে পারব। আপনার ছেলের কামরাটা আমরা তল্লাশী করব, আশা করি অনুমতি দেবেন আপনি?'

'কিন্তু···আমার ছেলে···' হঠাৎ করেই টি আলমের মনে পড়ে গেল, জেসমিন বলেছিল জুবের একটা মেয়েকে স্যুইটে এনেছিল··সেই মেয়েটিই কি ইফফাৎ সানিয়া?'···মানে, পরিষ্কার করে কথা বলুন, ইন্সপেক্টর। এই খুনের সাথে আমার ছেলের···?'

'হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে,' বলল গোলাম কিবরিয়া। 'আমরা সন্দেহ করছি, তিনিই খুন করেছেন সানিয়াকে।'

'এসব কি বলছেন আপনি!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন টি আলম। 'আপনার সন্দেহের কারণটা কি জানতে পারি?'

'যথা সময়ে অবশ্যই জানতে পারবেন, মিঃ আলম। আর কিছু বলার আগে আমরা আপনার ছেলের কামরাটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন টি আলম। ইন্সপেক্টরের মনে হল, সার্চ ওয়ারেন্টের অজুহাত তুলে তিনি বোধহয় তল্লাশী চালাতে বাধা দেবেন। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকালেন টি আলম, বললেন, 'বেশ। করুন তল্লাশী। কিন্তু আমি জানি, আমার ছেলের গোপন করার মতো কিছুই নেই।'

দরজা খুলে সনাতন আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে ইশারা করল ইন্সপেক্টর। লাউঞ্জে ঢুকল তারা। সেখান থেকে জুবেরের বেডরুমে।

ইতিমধ্যে আবার আরাম কেদারায় বসেছেন টি আলম। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়েছেন, কিন্তু সেটা টানার কথা মনে নেই। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছেন কার্পেটের দিকে। চেহারাটা রক্তশূন্য। মনে পড়ে গেল, জেসমিন বলেছিল, জুবেরকে তার ঠিক সুস্থ বলে মনে হয় না। জেসমিনের ধারণা, জুবের মানসিক ভাবে অসুস্থ। ওর মায়ের কথাও মনে পড়ে গেল। হাতে ছুরি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল সে···দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল টি আলমের।···কিন্তু, তাই বলে জুবের এ-ধরনের একটা ভয়ংকর কাজ করতে যাবে কেন? সত্যি কি পাগল সে? দূর, তা কি করে হয়। তাঁর নিজের ছেলে, তিনি জানেন না ছেলেটা পাগল কিনা। উহুঁ, অসম্ভব। কিন্তু···ইন্সপেক্টর লোকটাকে পুরোপুরি নিশ্চিত বলে মনে হল। কি প্রমাণ আছে তার হাতে? মাথাটা ঝিম ঝিম করতে শুরু করল। একটানা বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারছেন না। মনে পড়ল, আজ তাঁর সেই বিখ্যাত ছবিটার প্রদর্শনী। ব্যাপারটা যদি জটিল হয়ে ওঠে, ছবিটা কি দেখানো সম্ভব হবে?

জুবেরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। ইন্স-পেক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুখে হাসি হাসি ভাব। বলল,

'পুঁতি আর বালবে হাতের যে ছাপ পেয়েছি সেই হাতেরই ছাপ রয়েছে ওই কামরায়, স্যার।'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন টি আলম। 'হাতের ছাপ? কার, কিসের ছাপ?'

টি আলমের দিকে তাকাল গোলাব কিবরিয়া। এগিয়ে এসে তাঁর একটা হাত ধরে নরম সুরে বলল, 'আপনি শান্ত হয়ে বসুন, মিঃ আলম। সব খুলে বলছি আমি।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন টি আলম।

সনাতনের দিকে ফিরল গোলাব কিবরিয়া। 'মিঃ জুবেরকে খুঁজে বের করার জন্যে চারদিকে লোক পাঠিয়ে দাও। তিনি হয়ত কোথাও গা ঢাকা দিতে পারেন, কিংবা কক্সবাজার ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করতে পারেন—তাই, সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করতে হবে, আর লঞ্চ ঘাট, কোচ স্টেশন এবং মেইন রোডে পাহারা বসাতে হবে।

'জী, স্যার,' বলে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল সনাতন। তার সাথে বেরিয়ে গেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টও।

একটা চেয়ার টেনে বসল গোলাব কিবরিয়া। পকেট থেকে বের করে সিগারেট ধরাল সে। টি আলমের দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বলল, 'আপনার জন্যে ব্যাপারটা ভয়ংকর একটা আঘাত, বুঝতে পারি। আপনাকে সব কথা বলার এই অপ্রীতিকর দায়িত্বটা আমাকে পালন করতে হচ্ছে, সেজন্যে আমি দুঃখিত। একটা নয়, আপনার ছেলেকে দুটো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে খুঁজছি আমরা...'

'কি বলছেন!' পিউরে উঠলেন টি আলম। 'দুটো খুন! ফ্যাকাশে মুখটা ঝুলে পড়ল তাঁর।

'বলছি,' সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করল ইন্সপেক্টর।

প্রেম

হঠাৎ করে রাঙামাটি চলে গেছে বাবা, ফিরবে আজ বিকেলে, রাত জেগে একা স্যুইটে বসে আছে জিনেত। বাবা নেই বলেই আজ রাতে আর মাছ ধরতে যায়নি সে। তাছাড়া, ফোন করে আগেই জানিয়েছে জুবের, সে-ও সৈকতে যেতে পারবে না, তার সাথে দেখা করবে সকালে।

মাছ রাখার নেটটা ছিঁড়ে গেছে, বসে বসে সেটা সেলাই করছে জিনেত। কিন্তু ভাবছে জুবেরের কথা। ছেলেটা কিন্তু বেশ। অল্প বয়স, দেখতেও ভারি সুন্দর, আর কি সুন্দর ফ্রেঞ্চ বলে। নিশ্চয়ই কোন সংস্কৃতিবান পরিবারের ছেলে। মজার ব্যাপার হল, জুবের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা হয়নি তার। অথচ···ভাবতে গিয়ে একটু রাঙা হয়ে উঠল জিনেত···অথচ ছেলেটাকে ভালবেসে ফেলেছে সে। ভালবাসা একেই তো বলে, তাই না? সারাক্ষণ জুবেরের ছবি ভাসছে চোখের সামনে। ওকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ওর সব কিছু প্রায় অকারণেই বড় বেশি ভাল লাগে। এসব কিসের লক্ষণ? ভালবাসার নয়? হঠাৎ মনটা অস্থির হয়ে উঠল তার। জুবেরকে এখুনি একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। ইস্, কী বোকা সে। ওর ঠিকানাটাও লিখে রাখেনি। ফোন করে দেখলে হত, পাওয়া যায় কিনা। জুবে-রও যে তাকে ভালবেসে ফেলেছে, তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারে।

ঠক। ঠক। হঠাৎ মৃদু নকের আওয়াজে চমকে উঠল জিনেত। কানের ভুল? না। ওই যে, আবার। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জিনেত। কে হতে পারে? জুবের? নিশ্চয়ই বাবা নয়। বাবা হলে এত আস্তে আস্তে নক করত না। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কে?'

'আমি···দরজা খোল, জিনেত,' ফ্রেঞ্চ ভাষা, গলাটা জুবেরের।

সাথে সাথে দরজা খুলে দিল জিনেত। 'জুবের তুমি? এত রাতে? বাবা নেই তা তুমি জানলে কিভাবে?' এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। 'এস, ভেতরে এস।'

লাউঞ্জে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জুবের। এক গাল হেসে বলল, একটু আগে রিসেপশনে ফোন করেছিলাম। কেরাণী বলল, তোমার বাবা রাঙামাটি গেছেন···'

'অমনি চান্স নিতে ইচ্ছে করল, তাই না?' সারা মুখে দুষ্টামি মাখা হাসি ছড়িয়ে পড়ল জিনেতের। 'এসেছ ভালই করেছ। আমারও ঘুম আসছিল না। রাতটা গল্প করে কাটিয়ে দেয়া যাবে, কি বল? হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'তোমার হাতে ওটা কি?'

'দুপুরে ঢাকায় ফিরে যাব, হোটেল থেকে নাম কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি,' লাউঞ্জের এক ধারে ব্যাগটা নামিয়েরেখে জিনেতের সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। 'আমার সাথে যাবে নাকি?'

'কোথায়?' চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল জিনেত।

'ঢাকায়, কিংবা বর্ডার পার হয়ে কোলকাতায়? সেখান থেকে প্যারিসে? আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।'

'জুবের!' অবাক হয়ে তাকাল জিনেত। 'তুমি···'

জিনেতের একটা হাত ধরল জুবের। 'তুমি কি বুঝতে পারনি? আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'হ্যাঁ···না···মানে, আমিও···'হঠাৎ অপ্রতিভভাবে হেসে ফেলল জিনেত। 'কিন্তু, জুবের, আমার বাবাকে সব কথা জানানো দরকার, তারপর ধরো তোমার মা-বাবা কি বলেন সেটাও জানা দরকার···এমন হুট করে কিছু একটা করে বসা কি উচিত হবে?'

জিনেতের হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ধরল জুবের। 'এসব ব্যাপার পরে ভেবে দেখলেও চলবে। তার আগে ঠিক করতে হবে আমরা কি করতে চাই, তাই না?'

'হ্যাঁ···মানে, কি করবে বলে ভেবেছ তুমি?'

'মানে, জিজ্ঞেস করছ, তোমাকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি কিনা, তাই তো?'

মুখে চাপা হাসি নিয়ে চুপ করে থাকল জিনেত। মনে মনে ভাবছে, সব কিছু বড় বেশি তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে না কি? জুবেরকে ভাল লাগলেও, ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। এতটা এ-গোনো কি উচিত হচ্ছে?

'শোন তাহলে,' জিনেতকে টেনে নিয়ে এসে একটা সোফায় বসাল জুবের। নিজেও তার পাশে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। 'বাবা ছাড়া আপনজন কেউ নেই আমার। আর সেই বাবাও আমাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, পরিবার সম্পর্কে একটা কথাও তোমাকে আমি বলিনি। তার কারণ, আসলে আমার কোন পরিবার নেই। ওদের সাথে থাকি বটে, কিন্তু সেখানে আমি অবাঞ্ছিত।' একটু থেমে একটা সিগারেট ধরাল সে। 'পেটে মোটা-মুটি যেটুকু বিদ্যা আছে, আর ফরাসী ভাষার ওপর যেটুকু দখল আছে, তাতে আমার মনে হয়, প্যারিসে ছোটখাট একটা চাকরী যোগাড় করে নিতে পারব আমি।'

গভীর সহানুভূতির ছাপ দেখা গেল জিনেতের চেহারায়। ও, আচ্ছা, সেজন্যেই নিজের পরিবারের কথা এড়িয়ে গিয়েছিল জুবের। একটু চিন্তা করে বলল, 'চাকরীর ব্যাপারে বাবাও বোধহয় তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন…'

'ব্যাস, তাহলে তো সব সমস্যা মিটেই গেল,' উৎফুল্ল হয়ে উঠল জুবের। 'তুমিও চাকরী করবে। দু'জনের বেতনের টাকায় ভালই চলে যাবে আমাদের।' একটু থেমে নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার বলল সে, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি?'

এক দৃষ্টিতে জুবেরের দিকে তাকিয়ে আছে জিনেত। কি সুন্দর দেখতে ও! আর কি সরল! অথচ ওর বাবা ওকে দেখতে পারেন না। আমাকে ভালবাসে ও, আমিও…

'হঠাৎ রাত দুপুরে এসে এসব কথা বলছি, ব্যাপারটা তোমার কাছে বোধহয় খুব অস্বাভাবিক লাগছে, তাই না?' নিচু গলায় বলল জুবের। 'লাগারই কথা। কিন্তু, কি জান, জীবনে মায়ের স্নেহ কাকে বলে জানিনি। বাবা থেকেও নেই। তাই তুমি, আমার জীবনের প্রথম নারী, আমাকে ভালবাস বুঝতে পেরে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। এই কথাগুলো বলার জন্যেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। দেশে আর থাকতে চাই না, জিনেত। তুমি যদি আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলে কথা দাও, আমি প্যারিসে চলে যাব…আর কখনো ফিরবো না…'

জুবেরের দু'কাঁধে হাত রাখল জিনেত। সমস্ত দ্বিধা কেটে গেছে তার। 'জুবের, আমি তোমাকে ভালবাসি…' জুবেরের বুকে মাথা ঘষল সে। 'চল ঘরে যাই।'

'রাতটা কি এখানে কাটানো উচিত হবে?' জিনেতের বেডরুমে ঢুকে বলল জুবের। 'কেউ যদি জানতে পারে…'

'আসার সময় কেউ দেখেছে তোমাকে?'

'না।'

'তাহলে আর দুশ্চিন্তার কি আছে? সকালে একবার বাবার বন্ধু ঘ'াপল খবর নিতে আসবেন বটে, তাঁকে আমি নিচে থেকেই বিদায় করে দিতে পারব। বিকেলের আগে বাবা ফিরছেন না, কাজেই,' সলজ্জ হাসি মুখে নিয়ে একটু থামল, তারপর বলল, 'সময়টা আমরা খুব মজা করে কাটাতে পারব।'

হোটেল গোল্ডেন ইন। সকাল ছ'টা পঁচিশ:

চোখ মেলে বালিশ থেকে মাথা তুলল জুবের। বেডরুমটা ছোট্ট, অচেনা অচেনা লাগল। তারপর মনে পড়ে গেল সব। গোল্ডেন ইনে জিনেতের বেডরুম এটা। জেসমিন সব কথা বাবাকে বলে দেবে ভেবে গতরাতে রেনবো থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

তাড়াতাড়ি রিস্টওয়াচ দেখল জুবের। তারপর লক্ষ্য করল, পাশেই শুয়ে রয়েছে জিনেত। পরনে কিছু নেই, গায়ে শুধু এলোমেলো হয়ে রয়েছে একটা সাদা চাদর। হঠাৎ ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরে শুলো জিনেত, একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল জুবেরের গলা। তার মুখের ওপর ঠোঁট ঘষল জুবের। মাথাটা সচল হয়ে উঠল। সে-ই যে সানিয়াকে খুন করেছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশ তা জানে। কি করা উচিত এখন তার? এখানে সে মোটামুটি নিরাপদ…কেউ জানে না গোল্ডেন ইনে আছে সে। জিনেতের সাথে তার পরিচয় আছে তাও

কারো জানা নেই। নিশ্চয়ই ভোর অন্ধকার থেকেই খুঁজে বের করার জন্যে চারদিকে লোক পাঠিয়েছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। প্রথম ক'টা দিন খুব জোরেশোরে খোঁজাখুঁজি চলবে, তারপর তল্লাশীর ধার এবং ব্যাপকতা কমে আসবে। সেই সুযোগে কক্সবাজার ছেড়ে পালাতে হবে তাকে। কিন্তু আজ বিকেলেই জিনেতের বাবা ফিরে আসবেন, তার আগেই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। এই হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে একটা কামরা ভাড়া করা কঠিন হবে না। পরিচিত কেউ দেখে না ফেললেই হয় সবচেয়ে ভাল হয় জিনেতকে দিয়ে যদি কামরাটা ভাড়া করানো যায়। কারণ পুলিশ তাকে খুঁজে না পেলে বুলেটিনে নিশ্চয়ই তার ছবি ছাপার ব্যবস্থা করবে...হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে আঁতকে উঠল জুবের। বুলেটিনে ফরাসী ভাষাতেও খবরটা ছাপা হবে, তাহলে তো জিনেতও সব জেনে ফেলবে। তার মানে, এখানেও বেশিক্ষণ নিরাপদ নয় সে। বুলেটিনে কিছু ছাপা হবার আগেই জিনেতকে নিয়ে কক্সবাজার ছাড়তে হবে তাকে। হাত দিয়ে জিনেতকে আলিঙ্গন করল সে, আরো কাছে টেনে আনল। জিনেতকে হারাতে চায় না সে। ওকে নিয়েই পালাতে চায়। ঢাকা নয়, যশোর বর্ডার টপকে কোলকাতায় যাওয়াই সব দিক থেকে ভাল। ঢাকার পথ ধরলে নির্ঘাত তাকে পথেই ধরা পড়ে যেতে হবে। আগরতলায় যাওয়া যায়, সেখান থেকে কোলকাতা. কোলকাতা থেকে প্যারিস। জিনেতকে নিয়ে সুখের সংসার।

তার আলিঙ্গনের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল জিনেত। চোখ মেলে জুবেরকে দেখেই হাসি ফুটল মুখে। তার বুকে মুখ ঘষল সে, তারপর আদুরে গলায় বলল, 'আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের

দিন, জুবের।' আবার চোখ বুঁজল সে।

চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল জুবেরের। সেই ভয়ংকর মুহূর্তের দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে—সানিয়ার গলায় রেশমের রশিটা এঁটে দিচ্ছে। নিজের ওপর রাগে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় সারা শরীর রী রী করে উঠল। সেই সাথে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকল। কেন, কেন কাজটা করল সে। অনেক চেষ্টা করেও প্রশ্নটার কোন উত্তর খুঁজে পেল না। ক্লান্ত, বিরক্ত, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল বলে কি? না। যদিও মিছিমিছি এই অজুহাতটাই সে দেখিয়েছিল জেসমিনকে। জিনেতকে যা বলেছিল, সেই সাহস আর বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্যেও কাজটা করেনি সে। এখন, এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করছে, এসব কোনো কারণই ছিল না। এসব খোঁড়া যুক্তি নিজেকে ধোকা দেবার জন্যে খাড়া করেছিল।

আসলে, মনের ভেতর থেকে কে যেন তাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্ররোচিত করেছিল তাকে। এটাই যে নির্ভেজাল সত্য তা বুঝতে পেরে হিম-শীতল একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ অনুভব করল জুবের, সারা শরীর কেঁপে উঠল তার। সানিয়াকে খুন করার জন্যে তার মনের ভেতরের একটা বিশেষ শক্তি দায়ী, সেই শক্তিটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি সে, পারেনি প্রতিহত করতে। তবে কি এই দুর্বলতাকেই লোকে বলে পাগলামি? মনের কুমন্ত্রণা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যে তাকেই কি লোকে পাগল বলে? সে কি পাগল? কিন্তু···এই তো শান্ত ভাল মানুষের মতো শুয়ে রয়েছে সে, তার পাশে শুয়ে রয়েছে সুন্দরী এক বিদেশী মেয়ে, মেয়েটা তাকে দেখে শুনে ভালও বেসেছে—কই, নিজেকে তো তার পাগল বলে মনে হচ্ছে না। তার বোধ, অনুভূতি অসুস্থ বলে তো মনে হচ্ছে না।

তবে? তবে?…সদুত্তর না পেয়ে জিনেতকে আঁকড়ে ধরল সে।

জুবেরের বুকে মুখ রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে জিনেত। তার উদোম পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়ার কথা ভাবল জুবের। লোকটা চালাক-চতুর, নিশ্চয়ই সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় লোক পাঠিয়েছে তার খোঁজে। এই মুহূর্তে একটু যদি ভুল করে সে, ধরা পড়ে যেতে হবে। আর ধরা পড়লেই খুনের অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে…তারপর…

অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন কিছু হবে না পুলিশের পক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—অপরাধী বটে, কিন্তু পাগল। তাহলে? তাকে নিয়ে কি করবে ওরা? সন্দেহ নেই, পাগলাগারদে আটকে রাখা হবে তাকে। বনের হিংস্র পশুকে যেভাবে বন্দী করে রাখে…হিংস্র জন্তু…খুনী…পাগল…

'না! না! না!' অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জুবের। জিনেতের হাতটা গলা থেকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে দাঁড়াল। পর্দাটা সামান্য একটু সরাতেই রোদের ঝাঁঝ লাগল চোখে। রাস্তার ওপারের দোকান-পাট এখনও খোলেনি। দু'একজন পথিক দেখা গেল ফুটপাতে। হোটেল প্লাজার সামনে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশ। পুলিশের একটা জীপও দাঁড়িয়ে রয়েছে খানিকটা দূরে।

মনে মনে ভয় পেল জুবের। পুলিশ, পুলিশের গাড়ি এখনও চলে যায়নি কেন? প্লাজা থেকে কেউ বেরোয় কিনা দেখার জন্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়েই থাকল সে।

'তোমার হাতে কিসের দাগ ওগুলো, জুবের?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল জুবেরের বুক। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল, বিছানার ওপর উঠে বসেছে জিনেত, তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। 'কই...ও কিছু না।'

'কিছু না মানে?' চাদর গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নামতে গেল জিনেত। 'তোমার তিনটে আঙুলের ফাঁকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কালচে দাগ...'

হঠাৎ হুঁশ হল জুবেরের। বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে আঙুলের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলোয় তাকাল। শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে দাগগুলো। সানিয়া আঁচড়ে দিয়েছিল। মুখ তুলে তাকাল সে। বিছানা থেকে নেমে এসেছে জিনেত। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল সে। মৃদু ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর। 'তোমাকে আবার মনের সাধ মিটিয়ে চাই আমি, এখুনি...'

'এই! না!' ধাক্কা খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল জিনেত, ধস্তাধস্তি শুরু করল জুবেরের সাথে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই বুকে টেনে নিল তাকে, অস্ফুটে বলল, জুবের, আমার 'জুবের! আমি তো তোমারই...'

হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে উঠল জুবেরের। এত আদর, এত ভালবাসা জীবনে কারো কাছ থেকে পায়নি সে। ভিজে চোখ দুটো লুকাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিনেতের বুকে মুখ নামাল।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল জুবের। দেড় ঘণ্টা পর সেই আটটার দিকে ঘুম ভাঙল তার। চোখ মেলে পাশে জিনেতকে দেখতে না পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। বেডরূমের চারদিকে চোখ বুলাল, নেই কোথাও। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। ছোটে-

লের নিচে থেকে একটা লোকের গলা ভেসে আসছে, ফরাসী ভাষায় কথা বলছে সে। সর্বনাশ, জিনেতের বাবা ফিরে এল নাকি? লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ট্রাউজারটা গলিয়ে নিল পায়ে। শার্ট পরে বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল লাউঞ্জে, সেখান থেকে ভিড়ানো দরজা ঠেলে করিডোরে। রেলিঙের সামনে দাঁড়াতেই নিচের হলঘরে জিনেতকে দেখতে পেল সে। একজন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলছে জিনেত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জিনেত বলেছিল, বাবার বন্ধু জঁা পল খবর নেবার জন্যে আসবে। এই লোক-টাই তাহলে সেই জঁা পল। আধ বুড়ো, মাথার প্রায় সব চুল পেকে গেছে। কিন্তু ক্লিনশেভড। লোকটার কথা পরিষ্কার শুনতে পেল জুবের।

'তবে আর বলছি কি মা!' বুড়ো জঁা পল চোখ বড় বড় করে বলল, 'এই তো এখুনি পুলিশের সাথে কথা বলে এলাম আমি। আত্মহত্যা নয়, এটা খুন। তবে অপরাধ চাপা দেবার জন্যে ব্যাপার-টাকে আত্মহত্যার মতো করে সাজানো হয়েছিল।'

'কি ভয়ংকর!' আঁতকে উঠল জিনেত।

'পুলিশ বলছে, কাজটা একজন পাগলের। বলছে, তার পরিচয়ও নাকি জানে তারা,' বলে চলেছে জঁা পল, 'শোন, জিনেত, এসব পাগলকে বিশ্বাস নেই, বুঝলে? শুনেছি, এরা নাকি একটা খুন করে ক্ষান্ত হয় না, একের পর এক করতেই থাকে। তোমার বাবা না ফেরা পর্যন্ত সাবধানে থেক বুঝলে? বাইরে টাইরে না বেরোনোই ভাল। কেউ নক করলেই দরজা খুলে দিয়ো না।'

হেসে উঠল জিনেত। 'কাকার যেমন কথা! পাগলটা কি আর এখনও এই কক্সবাজারে আছে?'

'নেই তাই বা বলল কে তোমাকে? শুনেছি, খুনীরা নাকি খুনের জায়গায় ফিরে আসে। অবশ্য, তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। চিন্তা কর না, রাস্তার ওপারেই পুলিশ আছে। পাগলটা এদিকে আসবে বলে মনে হয় না। তবু, সাবধানের মার নেই, একটু সতর্ক হয়ে থেক। আমি তাহলে যাই? আবার একবার আসব'খন বিকেলের দিকে···বুলেটিনটা তোমার কাছে রাখতে চাও নাকি?'

এতক্ষণে জিনেতের হাতের দিকে নজর পড়ল জুবেরের। ভাঁজ করা একটা কাগজ রয়েছে তার হাতে। 'থাক,' বলল জিনেত। 'খুনের ব্যাপারে কি লিখেছে পড়ে দেখব।'

'ঠিক আছে,' বলে হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল প্রৌঢ় জাঁ পল।

তাড়াতাড়ি স্যুইটের ভেতর ফিরে এল জুবের। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ, উঠে আসছে জিনেত। বেডরূমে ঢুকে বিছানার ওপর বসে একটা সিগারেট ধরাল সে। মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শফিকুর রহমান আত্মহত্যা করেনি, পুলিশ তা জানল কিভাবে? পুলিশ যদি এত বুদ্ধি রাখে তাহলে সে পালাবে কিভাবে?

বেডরূমে ঢুকল জিনেত। ভাঁজ খোলা বুলেটিনে চোখ। বিছানার কাছে এসে তাকাল জুবেরের দিকে। 'আরে, ঘুম ভেঙে গেছে তোমার? এই, দারুণ একটা খবর। সানিয়া হত্যার ব্যাপারে পুলিশ যাকে খুঁজছিল তাকে পাওয়া গেছে। কিন্তু বেঁচে নেই। কি ভয়ংকর ভাবো ব্যাপার? প্রথমে মনে করা হয়েছিল লোকটা আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে আসলে তা নয়—খুন করা হয়েছে তাকে। সানিয়ার খুনীই তাকে খুন করেছে। খুনী নাকি পাগল···'

প্রচণ্ড রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল জুবেরের। 'আবার তাকে

পাগল বলে। তোমাকে না বলেছি, লোকটা পাগল হতে পারে না? যত সব আজেবাজে কথা…'

তর্ক করার জন্যে জিনেতও শ্বাস নিল। 'পাগল নয় মানে? একশোবার পাগল। ভাঁজ খোলা বুলেটিনের দিকে তাকাল সে। 'এই দেখ না, কি লিখেছে এখানে। ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া বলেছেন, খুনীকে তিনি চেনেন। লোকটা সানিয়াকে তো খুন করেছেই, সেটা সাংবাদিক শফিকুর রহমানের কাঁধে চাপাবার জন্যে তাকেও খুন করে ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে শফিকুর রহমান আত্মহত্যা করেছেন…'

'শফিক যে আত্মহত্যা করেনি তা ওরা বুঝল কিভাবে?'

'তা কিছু লেখেনি,' বলল জিনেত। বুলেটিনের ওপর চোখ রেখে এগিয়ে এল, বসল জুবেরের পাশে। 'শোন, কি লিখেছে পড়ছি।' দম নিয়ে শুরু করল সে, 'ইফফাৎ সানিয়ার হাতের নখে বেশ খানিকটা চামড়া পাওয়া গেছে। খুনী যখন গলায় ফাঁস পরিয়ে খুন করার চেষ্টা করছিল সানিয়াকে, তখনই সম্ভবতঃ খুনীকে আঁচড়ে দেয় সে। পুলিশের ধারণা, খুনীর হাতে তিনটে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া জানাচ্ছেন, হাতে এ-ধরনের ক্ষত আছে এমন কোন লোককে দেখতে পেলেই খবর দিতে হবে থানায়।' মুখ তুলে জুবেরের দিকে তাকাল জিনেত। 'ব্যাপারটা কেমন যেন বিদ-ঘুটে, তাই না? হাতে এই রকম সাইনবোর্ড নিয়ে খুনী পালায় কিভাবে? হাতের দাগ লুকানো কি সম্ভব…' হঠাৎ পাথর হয়ে গেল জিনেত পরমুহূর্তে চোখের দৃষ্টি পড়ল জুবেরের বাঁ হাতের আঙুলের ওপর। সেখানেই আটকে গেল দৃষ্টিটা। ধীরে ধীরে আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

বিছানা থেকে কখন উঠে দাঁড়িয়েছে জুবের, নিজেও তা বলতে পারবোনা। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। মড়া মানুষের মতো সাদা দেখাল চেহারাটা। পিছু হটতে হটতে দরজার কাছাকাছি চলে এল সে। হঠাৎ বাঁ হাতটা পিছন দিকে নিয়ে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করল সেটা।

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা। তারপর, হঠাৎ করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল জিনেত। মুখটা হাঁ হয়ে গেল— আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরল সে।

চৌদ্দ

সকাল আটটা। হোটেল রেনবো। সাতাশ নম্বর স্যুইট। লাউঞ্জে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন টি আলম. এই সময় একজন নার্স এসে বলল, 'মিসেস আপনাকে খুঁজছেন, মিঃ আলম।' খানিক ইতস্ততঃ করে আবার বলল সে, 'ডাক্তার সাহেব বলে গেছেন, মিসেসের বেশি কথা বলা বা অশান্ত হওয়া চলবে না—একটু খেয়াল রাখবেন, প্লীজ।'

'অবশ্যই।' তাড়াহুড়ো করে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন টি আলম। 'ধন্যবাদ। এখন কেমন আছে··· ?'

'মাথায় খুব যন্ত্রণা, তাছাড়া আর কোনো অভিযোগ নেই।'

স্ত্রীর বেডরুমে চলে এলেন টি আলম। মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে জেসমিন। বেডের এক ধারে বসলেন টি আলম, স্ত্রীর একটা হাত ধরলেন। চোখ মেলল জেসমিন। দৃষ্টিতে কেমন যেন ভয় ভয় ভাব। স্বামীকে দেখে চেহারাটা একটু উজ্জ্বল হল।

'এখন কেমন বোধ করছ, জেসমিন? উফ্, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে না।'

হঠাৎ স্বামীর হাতটা আঁকড়ে ধরল জেসমিন। বেডরুমের দরজা দিয়ে দ্রুত একবার বাইরে তাকাল। তার চোখে পরিষ্কার আতংক ফুটে উঠতে দেখলেন টি আলম। স্বামীর মুখের ওপর ফিরে এল জেসমিনের দৃষ্টি। 'জুবের...জুবের কোথায়?'

চেহারা গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল টি আলমের। প্রশ্নটা আশা করেননি তিনি। ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া সব কথা ব্যাখ্যা করে বলেছে তাঁকে, সেই থেকেই সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। জোর গলায় ইন্সপেক্টরকে বলেছেন বটে যে তাঁর ছেলে এ-ধরনের জঘন্য অপরাধ করতে পারে না, কিন্তু নির্জনে বসে সব কথা স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, জুবেরের মধ্যে আসলেও একটা পাগলামির ভাব আছে, তার পক্ষে এ-ধরনের কাজ করা একেবারে অসম্ভব নয়। স্ত্রীকে এসব বলে তার অশান্তি আর বাড়াতে চান না বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন, 'গেছে কোথাও। তার কথা ভেবে অস্থির হবার দরকার নেই তোমার...'

'না-না।' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেসমিন। 'তার কথা নয়, আমি নিজের কথা ভাবছি। জুবের...জুবের আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল।' হাঁপাতে শুরু করেছে সে। 'তোমাকে সব কথা

জানাইনি…'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন টি আলম। 'কি? কি বললে? জুবের তোমাকে…কি?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে তাঁর।

মাথার ব্যাণ্ডেজে একটা হাত ছোঁয়াল জেসমিন। 'মাথায়, আমার মাথায় পেপারওয়েট দিয়ে মেরেছে জুবের। মাগো!' শিউরে উঠল সে। 'সব কথা তোমাকে না জানিয়ে কি বোকামিই না করেছি! প্রথম থেকেই জানতাম আমি, সানিয়াকে খুন করেছে ও। কিন্তু তোমার মান সম্মানের কথা ভেবে কথাটা চেপে রেখেছিলাম…'

ধীরে ধীরে গভীর একটা শ্বাস নিলেন টি আলম। 'ঠিক আছে, জেসমিন, সব বুঝতে পেরেছি আমি। তুমি শান্ত হও। ডাক্তার তোমাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছেন।'

'চুলোয় যাক ডাক্তার!' স্বামীর হাত সরিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর ঝট করে উঠে বসল জেসমিন। 'জুবের কোথায় তাই বল। আমার ভয় করছে! আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। কোথায় সে? পুলিশকে খবর দাও!' হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সে। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, ও সুস্থ নয়। ওকে আটকে রাখা দরকার।'

স্তব্ধ হয়ে কয়েক সেকেণ্ড বসে থাকার পর টি আলম বললেন, 'ঠিক আছে। কথাটা তাহলে তোমাকে বলেই ফেলি। শোন, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। পুলিশ ওকে খুঁজে বের করার জন্যে সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে।' স্ত্রীকে কাছে টেনে আনলেন তিনি। 'শান্ত হও। ঠাণ্ডা মাথায় সব কথা খুলে বল আমাকে। কি হয়েছিল? সানিয়াকে যে সে-ই খুন করেছে তা তুমি জানলে কিভাবে?'

কান্না থামাল জেসমিন। দ্রুত, সংক্ষেপে সব কথা বলল সে।

গভীর মনোযোগের সাথে সব শুনলেন টি আলম। তারপর খাট থেকে উঠে পায়চারী শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে জেসমিন। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল তার। 'আজ তোমার ছবিটা দেখাবার কথা, না?'

পায়চারী থামিয়ে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন টি আলম। 'ছবি ...হ্যাঁ।' কিন্তু ওসব কথা আমি ভাবছি না, জেসমিন। ভাবছি জুবেরের কথা। ও যে এই রকম একটা বদ্ধ পাগল, বাপ হয়ে আমি তা কোনদিন বুঝতেও পারিনি। সেটা তো আমারই অযোগ্যতা, তাই না?' হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তাঁর। কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'এক মিনিট,' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। কি যেন খুঁজলেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। 'পিস্তলটা কোথাও দেখছি না।'

'তাহলে জুবেরই নিয়ে গেছে ..'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন টি আলম। আবার পায়চারী শুরু করলেন তিনি। 'ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলা দরকার। জুবেরের কাছে পিস্তল আছে...কেউ ওকে গ্রেফতার করতে গেলে গুলি করবে .. কাজেই ওদেরকে সাবধান করে দেয়াটা কর্তব্য আমার...কিন্তু তোমার ব্যাপারে কি বলব?...সানিয়াকে জুবের খুন করেছে, সেটা তুমি প্রথম থেকেই জানতে, এ-কথা ওদেরকে জানানো চলবে না। শেষ পর্যন্ত হয়ত ব্যাপারটা চেপে রাখা যাবে না, কিন্তু তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে ও যে তোমাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল সেকথা ওদেরকে জানানই উচিত।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছ!' প্রায় আঁতকে উঠল জেসমিন। 'আমার ভয় করছে।'

দরজার কাছে গিয়ে ইঙ্গিতে একজন নার্সকে ডাকলেন টি আলম। নার্স এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তাকে বললেন, 'আমি একটু নিচে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, যেই আসুক না কেন দরজা খুলবে না। আমার স্ত্রীকে ছেড়ে যাবেও না কোথাও। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল নার্স। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন টি আলম। 'এই যাব আর আসব, ভয়ের কিছু নেই।' বলে লাউঞ্জ বেরিয়ে এলেন তিনি, সেখান থেকে দরজা খুলে করিডোরে। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নার্স।

নিচে নেমে এসে সোজা সহকারী ম্যানেজারের অফিস কামরায় ঢুকলেন টি আলম। ভেতরে ঢোকার সময় রিস্টওয়াচ দেখলেন। ন'টার ওপর বাজে। ভেতরে ঢুকে দেখলেন, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। তাঁকে দেখেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'আমার ছেলের কোন খোঁজ পেলেন?'

সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে গোলাম কিবরিয়া বলল, 'বসুন, মিঃ আলম। না, এখনও কোন খবর পাইনি।'

'বুলেটিনে ছাপার জন্যে খবরটা পাঠিয়েছেন কি?'

'খবর একটা পাঠিয়েছি, বুলেটিনে তা ছাপাও হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে সব কথা প্রকাশ করিনি।'

'আপনি বরং আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বুলেটিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের সাথে দেখা করুন,' বললেন টি আলম। 'আমি অনুরোধ করলে ওরা আরেকটা বুলেটিন ছাপতে রাজি হবে।'

'আরেকটা বুলেটিন?'

'হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেপে নামাতে হবে ওটা, তারপর

দ্রুত বিলি করতে হবে। জুবেরের চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি থাকবে তাতে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর কাছে একটা লোডেড পিস্তল আছে, সেটা সবার জানা দরকার।'

শিরদাড়া খাড়া হয়ে গেল গোলাম কিবরিয়ার। 'বলেন কি! সাথে পিস্তল আছে? আপনি ঠিক জানেন?'

'জানি। ওর সাথে ধারাল একটা ক্ষুরও আছে। আপনার লোক-দের বলে দিন, তারা যেন সতর্ক থাকে।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গোলাম কিবরিয়া, সনাতনকে কিছু নির্দেশ দিয়ে একটু পরই আবার ফিরে এল সে। 'ছেলেটা সুস্থ নয়, বুঝলেন?' আবার বললেন তিনি। 'অনেক দিন থেকেই পাগলামির ভাব লক্ষ্য করা গেছে ওর মধ্যে, কিন্তু আমারই দোষ, ব্যাপারটাকে আমি কোন গুরুত্বই দিইনি। ওর মাও বদ্ধ পাগল ছিলেন। তিনি আমাকে··· খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাই আমি। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আরেকটা কথা। জুবের আমার বর্তমান স্ত্রীকেও খুন করার চেষ্টা করে···' ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে গেলেন তিনি।

নিঃশব্দে সব শুনল গোলাম কিবরিয়া। টি আলম চুপ করলেন, তারপরও অনেকক্ষণ কিছু বলল না সে। এক সময় জানতে চাইল, 'আপনার কাছে ওর কোন ছবি আছে?'

'বুলেটিনে ছাপতে চান? আছে কিনা জানি না, খুঁজে দেখতে হবে।' ঘুরে দাঁড়ালেন টি আলম, দরজার দিকে পা বাড়ালেন। হঠাৎ আবার ফিরলেন তিনি। বললেন, 'ওর কাছে হাজার দশেক টাকাও আছে।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

টি আলম বেরিয়ে যেতেই ঘরে এসে ঢুকল সনাতন। 'এখনও কোন খবর নেই। তবে, ওর কাছে যে পিস্তল আছে সেটা আমাদের সব

লোককে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'জুবের আলমের কাছে দশ হাজার টাকা আছে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'তার মানে, দূরে কোথাও চলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছে...'ব্লটিং পেপারের ওপর থেকে পেন্সিলটা তুলে নিতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল তার। ব্লটিং পেপারের ওপর কয়েকটা আঁচড়ের দাগ। ঝুঁকে পড়ে দেখল সে। পেন্সিল দিয়ে লেখা একটা ফোন নাম্বার, তার পাশে একটা নাম লেখা—জিনেত। ব্যাপারটা সাথে সাথেই মনে পড়ে গেল গোলাম কিবরিয়ার। এখানে ঢুকেই অনুমতি নিয়ে একটা নাম্বারে ফোন করেছিল জুবের। নাম্বারটা টুকে রেখেছিল সে। ফোনে কথা বলার সময় জিনেত নামটাও একবার উচ্চারণ করেছিল জুবের, সেটাও ফোন নাম্বারের পাশে লিখে রেখেছিল সে। মনে পড়ল, মেয়েটিকে জুবের আলম জানায়, রাতে আর দেখা হবে না, কাল সকালে দেখা করবে। দশাসই শরীরটা টান টান হয়ে উঠল গোলাম কিবরিয়ার। ঝট করে সহকারীর দিকে তাকাল সে। ব্লটিং পেপারে লেখা নাম্বারটা তাকে দেখিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'এই নাম্বারটা কোথাকার দেখ তো। তাড়াতাড়ি।'

ইন্সপেক্টরকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখে একটু অবাক হলেও কোন প্রশ্ন করল না সনাতন। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। কয়েক সেকেণ্ড অপর প্রান্তের কথা শুনল, তারপর ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, 'হোটেল গোল্ডেন ইনের নাম্বার।'

'জিজ্ঞেস কর, জিনেত নামে কোন বিদেশী মেয়ে ওখানে আছে কিনা।'

অপারেটরকে সনাতন প্রশ্ন করল, 'আপনাদের ওখানে জিনেত

নামে কোন মেয়ে আছে ?'

'একটা স্যুইট ভাড়া করেছেন এক ফরাসী ভদ্রলোক, তাঁর মেয়ের নাম জিনেত,' বলল অপারেটর। 'মেয়েটা স্যুইটেই আছে, ওর বাবা কাল রাঙামাটি গেছেন...'

'মেয়েটার সাথে একটু কথা বলতে চাই,' বলল সনাতন। 'যোগা-যোগটা করিয়ে দিন।'

বেশ একটু পর অপারেটর জানাল, 'রিং হচ্ছে, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ঘটনাটা ইন্সপেক্টরকে জানাল সনাতন। 'ঠিক আছে,' বলল গোলাম কিবরিয়া। 'অপারেটরকে বলে দাও, মেয়েটার স্যুইটে রিং করার আর দরকার নেই।'

কয়েকটা কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সনাতন। ইতি-মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে গোলাম কিবরিয়া, উত্তেজিতভাবে বলল, 'গোল্ডেন ইনে চল, কুইক। থানায় ফোন করে পনের জন আর্মড পুলিশের কথা বল, ওদিক থেকে রওনা হয়ে যাক ওরা...কুইক।'

সনাতন হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল। কামরায় ঢুকলেন টি আলম। বললেন, 'জুবেরের একটা ফটো পেয়েছি...'

তাঁকে থামিয়ে দিল গোলাম কিবরিয়া, বলল, 'ওটার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না। আপনার ছেলে সম্ভবতঃ গোল্ডেন ইনে আছে...'

'আপনাদের সাথে যেতে পারি আমি ?' শান্ত ভাবে জানতে চাইলেন টি আলম। 'তাতে হয়ত আপনাদের সুবিধেই হবে।'

'অবশ্যই—'

'তাহলে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করুন...' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন টি আলম। স্ত্রীকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে একটু পরই নেমে এলেন তিনি। ইতিমধ্যে থানায় ফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া শেষ করেছে সনাতন।

রেনবো থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ল ওরা।

নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে জিনেত। তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে জুবের। হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। দু'জনেই চমকে উঠল। জিনেত ফোনের দিকে তাকাতেই সাবধান করে দিয়ে বলল জুবের, 'ফোনটা ধ'রো না।'

মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে জিনেতের। এত সুন্দর একটা ছেলে, খুনী? একটা খুনীকে ভালবেসেছে সে? কাল রাতে একজন খুনীকে সব উজাড় করে দিয়েছে সে? ফোনটা ধরতে নিষেধ করছে —তার মানে, কোন সন্দেহ নেই একেই পুলিশ খুঁজছে।

'অমন করছ কেন?' হঠাৎ জুবেরের চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল। 'দাঁড়াও ওখানে। আমার কথা শোন আগে। বুঝতে পারছি, আমাকে তোমার ভয় করছে। কিন্তু তার কোন কারণ নেই। বিশ্বাস কর জিনেত যা ঘটে গেছে তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

এখনও বাজছে টেলিফোন।

'আশ্চর্য! বলেছি না, তোমাকে আমি ভালবাসি? তবু এত ভয় পাচ্ছ কেন?' জিনেতকে পিছিয়ে যেতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে জুবেরের। 'কিভাবে ভাবতে পারছ আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি?'

থমকে দাঁড়াল জিনেত। পিছু হটে কোথায় যাচ্ছে, হঠাৎ সেটা উপলব্ধি করতে পেরে দিশেহারা হয়ে উঠল সে। পিছনে দেয়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে এগোতে হলে জুবেরকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

'কাগজে আমার সম্পর্কে যা লিখেছে সব মিথ্যে,' বলল জুবের। 'আমি পাগল নই। তুমিই বল, আমাকে কি অসুস্থ বলে মনে হয়? মেয়েটাকে···সানিয়াকে খুন করতে চাইনি আমি···ওটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট। প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল ও, আমি ওকে অপমান করি, কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বলি। তাতেই রেগে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয় ও, ইচ্ছে ছিল লোকজন জড়ো করে আমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবে। ওর চিৎকারটা থামাতে যাই আমি, আর কোন উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই ওর গলাটা চেপে ধরতে হয়েছিল আমাকে। উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম, বুঝতেই পারিনি মেরে ফেলছি ওকে। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কথাগুলো বিশ্বাস করছ তো, জিনেত?'

ঠক ঠক করে কাঁপছে জিনেত।

দাঁতে দাঁত চেপে রাগটা সামলাল জুবের। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে জিনেতের গালে প্রচণ্ড এক চড় মারে, থামিয়ে দেয় কাঁপুনিটা। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল সে। 'আর ওই শফিকুর রহমান, সে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে। কাজেই আমিও পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম। জানই তো, জোচ্চোররা সবাই ভীতু হয়। পুলিশকে বলে দেব এই ভয়েই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে। অথচ ওরা বলছে, আমিই নাকি তাকে খুন করেছি। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়?'

নিজের কানে হাত চাপা দিল জিনেত। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'চুপ কর। এসব আমি শুনতে চাই না।' নিশ্চয়ই পাগল ও, ভাবল সে। তা না হলে এই রকম মিথ্যে অজুহাত দেয় কিভাবে? 'প্লীজ, তুমি চলে যাও। এখুনি হয়ত পুলিশ এসে পড়বে, তুমি চলে…'

'কোথায় যাব?' হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল জুবেরের। 'পুলিশ আমাকে খুঁজছে। বাইরে বেরুলেই ধরা পড়ে যাব। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে তুমি আমাকে চলে যেতে বল? তুমি না আমাকে ভালবাস? ভালবাসার এই বুঝি নমুনা? না, জিনেত, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে, সে আমি সহ্য করতে পারব না। শোন, আবার বলছি, কাগজে যা লিখেছে তা এক বর্ণও সত্যি নয়। আমি পাগল নই, আমি কাউকে ইচ্ছে করে খুনও করিনি।' জিনেতের দিকে এক পা এগোল সে। আতঙ্কে উঠে পিছিয়ে গেল জিনেত, তার পিঠ ঠেকল দেয়ালে। 'আজ রাত না নামা পর্যন্ত আমাকে তুমি এই হোটেলে কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর। রাতের অন্ধকারে আমরা পালাব, কেমন? প্যারিসে গিয়ে বিয়ে করব আমরা…'

আতংকের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে জিনেত। এখন আত্মরক্ষার কথা ভাবছে সে। বুঝতে পারছে, সাংঘাতিক এক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে সে। জুবের যে পাগল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ওর কথায় রাজি না হলে ও হয়ত তাকেও খুন করার চেষ্টা করবে…

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল জিনেত। 'কিন্তু রাত নামার আগেই যদি পুলিশ এসে পড়ে?'

সেই অর্থহীন হাসিটা দেখা গেল জুবেরের মুখে। 'পুলিশকে আমি ভয় করি না,' বলল সে। 'আমার কাছে পিস্তল আছে।'

চোখ দুটো আবার বিস্ফারিত হয়ে উঠল জিনেতের। বলে কি! পাগলটা পুলিশকেও খুন করতে চায়। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। এগিয়ে আসছে জুবের।

'দোহাই জুবের, এগিয়ো না।' হাত দুটো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে তুলে বলল জিনেত। 'আমার ভয় করছে। কাছে এস না...!'

থমকে দাঁড়াল জুবের। ধীরে ধীরে বীভৎস হয়ে উঠল চেহারাটা। 'তার মানে, আমার একটা কথাও বিশ্বাস হয়নি তোমার?' চোখ রাঙিয়ে জানতে চাইল সে।

মুখের সামনে হাত তুলে সে-দুটো দ্রুত নাড়ছে জিনেত, বিড় বিড় করছে অনবরত, 'না। না। দূরে থাক, প্লীজ। এস না। কাছে এস না, দোহাই লাগে। আমার ভয় করছে।'

'খুন করো ওকে,' মনের ভেতর থেকে নির্দেশ পেল জুবের। 'ওকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। যাও, দেরি করো না, সেরে ফেল কাজটা। তোমার প্রতি কোন ভালবাসা নেই ওর মধ্যে। ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পার না। আর সবার মতো ওরও ধারণা, তুমি পাগল। ও তোমাকে পাগল ভাববে, আর তুমি সেটা মেনে নেবে, তা হয় না। যে মেয়ে তোমাকে তার দেহ-মন দেয়ার পরও সামান্য একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারে না, বেঁচে থাকার তার কোন অধিকার নেই। যাও, খুন কর ওকে। জেটিতে ওর বোট আছে, সেটা নিয়ে পালাতে পারবে তুমি। তার আগে চুকিয়ে ফেল ঝামেলাটা।'

ধীরে ধীরে ট্রাউজারের ব্যাক পকেটে হাত ভরল জুবের। সরু সরু আঙুল দিয়ে পিস্তলটা স্পর্শ করল। মনের ভেতর নিজের সাথে যুদ্ধ চলছে। যত যাই হোক, জিনেতকে ভালবেসেছে সে, তাকে

কি খুন করা উচিত? না-না। কিন্তু সেই সাথে জুবের এ-ও বুঝতে পারল, মনের নির্দেশ বেশিক্ষণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। পিস্তলটা বের করল সে। কিন্তু হঠাৎ মনের ভেতর থেকে কে যেন ধমকে উঠল, বোকামি কর না। গুলির আওয়াজ হলে লোকজন ছুটে আসবে। তারচেয়ে টেবিলের ওপর ওই যে পানির বোতলটা রয়েছে ওটা দিয়ে ওর মাথায় মারো। আর দাঁড়িয়ে থেক না যাও। মারো!

পিস্তলটা পকেটে রেখে দিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল জুবের। জিনেত্তের দিকে চোখ রেখে তুলে নিল ভারি বোতলটা। অস্ফুট আর্তনাদ করে দরজার দিকে ছুটল জিনেত্ত। কিন্তু তার পথ আগলে দাঁড়াল জুবের। 'কোথায় যাচ্ছ?' জিনেত্তের মাথা লক্ষ্য করে বোতলটা তুলল সে। ভয়ে, আতংকে থর থর করে কাঁপছে জিনেত্ত। হুহু করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'কেন? কেন? কি করেছি আমি তোমার? আমি কি জানতাম তুমি একটা...'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ বোতলটা টেবিলের ওপর রেখে দিল জুবের। 'তুমি জানতে না আমি একটা পাগল। আমিও কি জানতাম? এখন, এই প্রথম সন্দেহ হচ্ছে আমারও, আমি বোধহয় পাগলই।' হঠাৎ জিনেত্তের দিকে এক পা এগোল সে। 'পাগলের হাতে কেউ নিরাপদ নয়।' চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে তার। প্রচণ্ড আবেগে থরথর করে কাঁপছে সে। 'পালাও। জিনেত্ত, ভাল চাও তো পালাও আমার কাছ থেকে।' ধরা পড়ার ভয় আছে, সে কথা যেন মনে নেই তার, চিৎকার করে বলল, 'বাঁচতে চাইলে এখুনি পালাও। তাড়াতাড়ি কর, জিনেত্ত। দেরি করলে আমি হয়ত নিজেকে সামলে রাখতে পারব না। যাও, বেরিয়ে যাও।' হাত তুলে জিনেত্তকে দরজাটা দেখাল সে। 'খোদার দোহাই, দাঁড়িয়ে থেক না। বেরোও...

বুঝতে পারছে জুবের, আর বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর আর মনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার শক্তি পাবে না সে। ভাবতে ভাবতেই, টেবিলের দিকে ঘুরল সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল বোতলটা।

সঁ্যাত করে ছুটে গেল জিনেত। এক ঝটকায় দরজা খুলেই বেরিয়ে এল লাউঞ্জে। পিছন ফিরে তাকাল না সে। আরেকটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল করিডোরে। বেরবার সময় দরজার চৌকাঠে পা বেধে ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক জোড়া বুট জুতোর সামনে।

এই মাত্র দোতালার করিডোরে এসে পৌচেছে পুলিশ। 'ধর, ধর, তোলো ওকে,' দ্রুত নির্দেশ দিল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। দু'জন কনস্টেবল এগিয়ে এসে ধরল জিনেতকে। দাঁড় করাল। 'শান্ত হও। বল, কোথায় সে?'

ভাষা না বুঝলেও, প্রশ্নটা বুঝতে অসুবিধে হল না জিনেতের। হাত তুলে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে নিজের বেডরুমটা দেখাল সে। সাথে সাথে লাউঞ্জের দরজার দিকে পা বাড়াল ইন্সপেক্টর।

'না। দাঁড়ান।' বাধা দিলেন টি আলম। 'আগে আমি যাই। ওর কাছে পিস্তল আছে...'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ইন্সপেক্টর বলল, 'সেজন্যেই আপনার যাওয়া উচিত হবে না, মিঃ আলম। ওর পক্ষে এখন সব সম্ভব। না, আপনাকে আমি আগে যেতে দিতে পারি না।'

'কি বলতে চান, ইন্সপেক্টর?' অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সাথে বললেন টি আলম। 'নিজের ছেলেকে ভয় পেতে হবে নাকি? পথ ছাড়ুন। একমাত্র আমিই ওকে সামলাতে পারব।'

লাউঞ্জে ঢুকলেন টি আলম। জিনেতের বেডরুমের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'কোথায় তুমি, জুবের? লক্ষ্মী বাবা, কথা শোন।

তোমাকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কই, বেরিয়ে এস। যাই ঘটে থাকুক, দু'জন পরামর্শ করে ব্যাপারটা আমরা সামলে নেব, দেখ তুমি। জুবের!' বললেন বটে, কিন্তু সাথে সাথে এ ও বুঝলেন যে কথাগুলো একেবারেই অর্থহীন। ছেলেটাকে সাহায্য করার আর কোন উপায় নেই। সে সুযোগ অনেক আগেই নিজের দোষে হারিয়েছেন তিনি।

জিনেতের বেডরুমের কাছে পৌঁছে গেছেন তিনি, এই সময় গুলির আওয়াজটা হল। শিউরে উঠলেন তিনি। পা বাড়াতে গিয়ে টলে উঠলেন। ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল ইন্সপেক্টর গোলাম কিবরিয়া। দু'জন কনস্টেবলের হাতে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সামনে পা বাড়াল সে। গুলি হয়েছে তিন সেকেণ্ড হয় নি, এই সময় বেডরুমের ভেতর থেকে ভেসে এল ভারি কিছু পতনের আওয়াজ। সেই সাথে চাপা একটা গোঙানির শব্দ।

লাফ দিয়ে দরজাটা টপকে বেডরুমের ঢুকল গোলাম কিবরিয়া। একটু পরই বেরিয়ে এল সে। টি আলমের দিকে চোখ পড়তেই দেখল, তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। মাথাটা আপনা থেকেই নিচু হয়ে গেল ইন্স'পক্টরের।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন টি আলম।

—: শেষ :—